লিপিকা

লিপিকা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রকাশক

ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড্

এলাহাবাদ

১৯২২

মূল্য এক টাকা বারো আনা

প্রকাশক
শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু
ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, এলাহাবাদ

প্রাপ্তিস্থান ঃ
১। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস
২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
২। ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড—এলাহাবাদ

কান্তিক প্রেস
২২ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা

লিপিকা

পায়ে-চলার পথ

১

এই ত পায়ে-চলার পথ।

এসেছে বনের মধ্যে দিয়ে মাঠে, মাঠের মধ্যে দিয়ে নদীর ধারে, খেয়া-ঘাটের পাশে বটগাছ-তলায়; তার পরে ওপারের ভাঙা ঘাট থেকে বেঁকে চলে গেছে গ্রামের মধ্যে; তার পরে তিসির ক্ষেতের ধার দিয়ে, আমবাগানের ছায়া দিয়ে, পদ্ম-দিঘির পাড় দিয়ে, রথতলার পাশ দিয়ে কোন্ গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছেচে জানিনে।

এই পথে কত মানুষ কেউবা আমার পাশ দিয়ে চলে গেছে, কেউবা সঙ্গ নিয়েচে, কাউকে বা দূর থেকে দেখা গেল; কারো বা ঘোম্‌টা আছে, কারো বা

নেই ; কেউবা জল ভর্‌তে চলেচে, কেউবা জল নিয়ে ফিরে এল।

২

এখন দিন গিয়েছে, অন্ধকার হয়ে আসে।

একদিন এই পথকে মনে হয়েছিল আমারই পথ, একান্তই আমার ; এখন দেখ্‌চি কেবল একটি-বার মাত্র এই পথ দিয়ে চল্‌বার হুকুম নিয়ে এসেচি, আর নয়।

নেবুতলা উজিয়ে, সেই পুকুর-পাড়, দ্বাদশ দেউলের ঘাট, নদীর চর, গোয়াল-বাড়ি, ধানের গোলা পেরিয়ে সেই চেনা চাউনি, চেনা কথা, চেনা মুখের মহলে আর একটিবারও ফিরে গিয়ে বলা হবে না, "এই যে!" এ পথ যে চলার পথ, ফেরার পথ নয়।

আজ ধূসর সন্ধ্যায় একবার পিছন ফিরে তাকালুম, দেখ্‌লুম, এই পথটি বহুবিস্মৃত পদচিহ্নের পদাবলী, ভৈরবীর সুরে বাঁধা।

যত কাল যত পথিক চলে গেছে তাদের জীবনের সমস্ত কথাকেই এই পথ আপনার একটি মাত্র ধূলিরেখায় সংক্ষিপ্ত করে এঁকেচে ; সেই একটি রেখা চলেচে সূর্য্যোদয়ের দিক্ থেকে সূর্য্যাস্তের দিকে, এক সোনার সিংহদ্বার থেকে আরেক সোনার সিংহদ্বারে।

৩

"ওগো পায়ে-চলার পথ, অনেক কালের অনেক কথাকে তোমার এই ধূলি-বন্ধনে বেঁধে নীরব করে রেখোনা। আমি তোমার ধূলোয় কান পেতে আছি, আমাকে কানে-কানে বল।"

পথ নিশীথের কালো পর্দ্দার দিকে তর্জ্জনী বাড়িয়ে চুপ করে থাকে।

"ওগো পায়ে-চলার পথ, এত পথিকের এত ভাবনা এত ইচ্ছা, সে-সব গেল কোথায়?"

বোবা পথ কথা কয় না। কেবল সূর্য্যোদয়ের দিক থেকে সূর্য্যাস্তের দিক পর্য্যন্ত ইসারা মেলে' রাখে।

"ওগো পায়ে-চলার পথ, তোমার বুকের উপর যে-সমস্ত চরণপাত একদিন পুষ্পবৃষ্টির মত পড়েছিল আজ তারা কি কোথাও নেই?"

পথ কি নিজের শেষকে জানে, যেখানে সমস্ত লুপ্ত ফুল আর স্তব্ধ গান পৌঁছল, যেখানে তারার আলোয় অনির্ব্বাণ বেদনার দেয়ালি-উৎসব হচ্চে?

মেঘলা দিনে

রোজই থাকে সমস্ত দিন কাজ, আর চারদিকে লোকজন। রোজই মনে হয় সেদিনকার কাজে সেদিনকার আলাপে সেদিনকার সব কথা দিনের শেষে বুঝি একেবারে শেষ করে দেওয়া হয়। ভিতরে কোন কথাটি যে বাকি রয়ে গেল তা বুঝে নেবার সময় পাওয়া যায় না।

আজ সকাল বেলা মেঘের স্তবকে স্তবকে আকাশের বুক ভরে উঠেচে। আজও সমস্ত দিনের কাজ আছে সামনে, আর লোক আছে চারদিকে। কিন্তু আজ মনে হচ্চে ভিতরে যা-কিছু আছে বাইরে তা সমস্ত শেষ করে দেওয়া যায় না।

মানুষ সমুদ্র পার হল, পর্ব্বত ডিঙিয়ে গেল, পাতাল-পুরীতে সিঁধ কেটে মণি-মাণিক চুরি করে আনলে, কিন্তু একজনের অন্তরের কথা আরেকজনকে চুকিয়ে দিয়ে ফেলা, এ কিছুতেই পারলে না।

আজ মেঘলা দিনের সকালে সেই আমার বন্দী কথাটাই মনের মধ্যে পাখা ঝাপ্‌টে মরচে। ভিতরের মানুষ বল্‌চে; "আমার চিরদিনের সেই আরেকজনটি কোথায়, যে আমার হৃদয়ের শ্রাবণ মেঘকে ফতুর করে তার সকল বৃষ্টি কেড়ে নেবে!"

আজ মেঘলা দিনের সকালে শুন্‌তে পাচ্চি সেই ভিতরের কথাটা কেবলি বন্ধ দরজার শিকল নাড়চে। ভাবচি, "কি করি! কে আছে যার ডাকে কাজের বেড়া ডিঙিয়ে এখনি আমার বাণী সুরের প্রদীপ হাতে বিশ্বের অভিসারে বেরিয়ে পড়বে? কে আছে যার চোখের একটি ইসারায় আমার সব ছড়ানো ব্যথা এক মুহূর্ত্তে এক আনন্দে গাঁথা হবে, এক আলোতে জ্বলে উঠবে? আমার কাছে ঠিক সুরটি লাগিয়ে চাইতে পারে যে, আমি তাকেই কেবল দিতে পারি। সেই আমার সর্ব্বনেশে ভিখারী রাস্তার কোন্ মোড়ে?"

আমার ভিতর মহলের ব্যথা আজ গেরুয়াবসন পরেচে। পথে বাহির হতে চায়, সকল কাজের বাহিরের পথে,—যে-পথ একটিমাত্র সরল তারের এক-তারার মত, কোন্ মনের মানুষের চলায় চলায় বাজ্‌চে।

বাণী

১

ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি হয়ে আকাশের মেঘ নামে,—মাটির কাছে ধরা দেবে বলে'। তেমনি কোথা থেকে মেয়েরা আসে পৃথিবীতে বাঁধা পড়তে।

তাদের জন্য অল্প জায়গার জগৎ, অল্প মানুষের। ঐটুকুর মধ্যে আপনার সবটাকে ধরানো চাই—আপনার সব কথা, সব ব্যথা, সব ভাবনা। তাই তাদের মাথায় কাপড়, হাতে কাঁকন, আঙিনায় বেড়া। মেয়েরা হল সীমাস্বর্গের ইন্দ্রাণী।

কিন্তু কোন্ দেবতার কৌতুকহাস্যের মত অপরিমিত চঞ্চলতা নিয়ে আমাদের পাড়ায় ঐ ছোট মেয়েটির জন্ম? মা তাকে রেগে বলে "দস্যি," বাপ তাকে হেসে বলে "পাগলী"।

সে পলাতকা ঝরণার জল, শাসনের পাথর ডিঙিয়ে

চলে। তার মনটি যেন বেণুবনের উপরডালের পাতা, কেবলি ঝির্ ঝির্ করে কাঁপচে।

২

আজ দেখি সেই দুরন্ত মেয়েটি বারান্দায় রেলিঙে ভর দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে—বাদলশেষের ইন্দ্রধনুটি বল্লেই হয়। তার বড় বড় দুটি কালো চোখ আজ অচঞ্চল, তমালের ডালে বৃষ্টির দিনে ডানা-ভেজা পাখীর মত।

ওকে এমন স্তব্ধ কখনো দেখিনি। মনে হল, নদী যেন চল্‌তে চল্‌তে একজায়গায় এসে থম্‌কে সরোবর হয়েচে।

৩

কিছুদিন আগে রৌদ্রের শাসন ছিল প্রখর; দিগন্তের মুখ বিবর্ণ; গাছের পাতাগুলো শুক্‌নো হল্‌দে, হতাশ্বাস।

এমন সময় হঠাৎ কাল আলুথালু পাগ্‌লা মেঘ আকাশের কোণে কোণে তাঁবু ফেল্‌লে। সূর্য্যাস্তের একটা রক্ত-রশ্মি খাপের ভিতর থেকে তলোয়ারের মত বেরিয়ে এল

অর্দ্ধেক রাত্রে দেখি দরজাগুলো খড়্‌খড়্ শব্দে

কাঁপ্‌চে। সমস্ত সহরের ঘুমটাকে ঝড়ের হাওয়া ঝুঁটি ধরে ঝাঁকিয়ে দিলে।

উঠে দেখি, গলির আলোটা ঘন বৃষ্টির মধ্যে মাতালের ঘোলা চোখের মত দেখতে। আর গির্জ্জের ঘড়ির শব্দ এল যেন বৃষ্টির শব্দের চাদর মুড়ি দিয়ে।

সকাল বেলায় জলের ধারা আরো ঘনিয়ে এল— রৌদ্র আর উঠ্‌ল না।

৪

এই বাদলায় আমাদের পাড়ার মেয়েটি বারান্দার রেলিঙ ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে।

তার বোন এসে তাকে বল্লে, 'মা ডাক্‌চে'। সে কেবল সবেগে মাথা নাড়ল, তার বেণী দুলে উঠ্‌ল ; কাগজের নৌকো নিয়ে তার ভাই তার হাত ধরে টান্‌লে। সে হাত ছিনিয়ে নিলে। তবু তার ভাই খেলার জন্যে টানাটানি করতে লাগ্‌ল। তাকে এক থাপড় বসিয়ে দিলে।

৫

বৃষ্টি পড়চে। অন্ধকার আরো ঘন হয়ে এল। মেয়েটি স্থির দাঁড়িয়ে।

আদি যুগে সৃষ্টির মুখে প্রথম কথা জেগেছিল জলের ভাষায়, হাওয়ার কণ্ঠে। লক্ষ কোটি বছর পার হয়ে

সেই স্মরণ বিস্মরণের অতীত কথা আজ বাদ্‌লার কলস্বরে ঐ মেয়েটিকে এসে ডাক দিলে। ও তাই সকল বেড়ার বাইরে চলে গিয়ে হারিয়ে গেল।

কত বড় কাল, কত বড় জগৎ, পৃথিবীতে কত যুগের কত জীবলীলা। সেই সুদূর সেই বিরাট, আজ এই দুরন্ত মেয়েটির মুখের দিকে তাকাল, মেঘের ছায়ায় বৃষ্টির কলশব্দে।

ও তাই বড় বড় চোখ মেলে নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে রইল,—যেন অনন্তকালেরই প্রতিমা।

মেঘদূত

১

মিলনের প্রথম দিনে বাঁশি কি বলেছিল ?

সে বলেছিল, "সেই মানুষ আমার কাছে এল, যে মানুষ আমার দূরের।"

আর বাঁশি বলেছিল, "ধর্‌লেও যাকে ধরা যায় না তাকে ধরেচি, পেলেও সকল-পাওয়াকে যে ছাড়িয়ে যায় তাকে পাওয়া গেল।"

তারপরে রোজ বাঁশি বাজে না কেন ?

কেন না, আধখানা কথা ভুলেচি। শুধু মনে রইল সে কাছে; কিন্তু সে যে দূরেও তা খেয়াল রইল না; প্রেমের যে-আধখানায় মিলন সেইটেই দেখি, যে-আধখানায় বিরহ সে চোখে পড়ে না, তাই দূরের চিরতৃপ্তিহীন দেখাটা আর দেখা যায় না, কাছের পর্দ্দা আড়াল করেচে।

দুই মানুষের মাঝে যে-অসীম আকাশ সেখানে সব চুপ, সেখানে কথা চলে না। সেই মস্ত চুপকে বাঁশির

সুর দিয়ে ভরিয়ে দিতে হয়। অনন্ত আকাশের ফাঁক না পেলে বাঁশি বাজে না।

সেই আমাদের মাঝের আকাশটি আঁধিতে ঢেকেচে, প্রতিদিনের কাজে কর্ম্মে কথায় ভরে গিয়েচে, প্রতিদিনের ভয়ভাবনা কৃপণতায়।

২

এক-একদিন জ্যোৎস্নারাত্রে হাওয়া দেয়, বিছানার পরে জেগে বসে বুক ব্যথিয়ে ওঠে, মনে পড়ে এই পাশের লোকটিকে ত হারিয়েচি।

এই বিরহ মিট্‌বে কেমন করে, আমার অনন্তের সঙ্গে তার অনন্তের বিরহ ?

দিনের শেষে কাজের থেকে ফিরে এসে যার সঙ্গে কথা বলি সে কে ? সে ত সংসারের হাজার লোকের মধ্যে একজন, তাকে ত জানা হয়েচে, চেনা হয়েচে, সে ত ফুরিয়ে গেচে।

কিন্তু ওর মধ্যে কোথায় সেই আমার অফুরান একজন, সেই আমার একটি মাত্র ? ওকে আবার নূতন করে খুঁজে পাই কোন্ কূলহারা কামনার ধারে ?

ওর-সঙ্গে আবার একবার কথা বলি সময়ের কোন্ ফাঁকে, বনমল্লিকার গন্ধে নিবিড় কোন্ কর্ম্মহীন সন্ধ্যার অন্ধকারে ?

৩

এমন সময়ে নববর্ষা ছায়া-উত্তরীয় উড়িয়ে পূর্ব্ব-দিগন্তে এসে উপস্থিত। উজ্জয়িনীর কবির কথা মনে পড়ে গেল। মনে হল প্রিয়ার কাছে দূত পাঠাই।

আমার গান চলুক উড়ে, পাশে থাকার সুদূর দুর্গম নির্ব্বাসন পার হয়ে যাক।

কিন্তু তা হলে তাকে যেতে হবে, কালের উজান পথ বেয়ে বাঁশির ব্যথায় ভরা আমাদের প্রথম মিলনের দিনে, সেই আমাদের যে-দিনটি বিশ্বের চিরবর্ষা ও চিরবসন্তের সকল গন্ধে সকল ক্রন্দনে জড়িয়ে রয়ে গেল, কেতকীবনের দীর্ঘনিশ্বাসে, আর শালমঞ্জরীর উতলা আত্মনিবেদনে।

নির্জ্জন দীঘির ধারে নারিকেলবনের মর্ম্মর-মুখরিত বর্ষার আপন কথাটিকেই আমার কথা করে নিয়ে প্রিয়ার কানে পৌঁছিয়ে দিক্, যেখানে সে তার এলোচুলে গ্রন্থি দিয়ে, আঁচল কোমরে বেঁধে সংসারের কাজে ব্যস্ত।

৪

বহুদূরের অসীম আকাশ আজ বনরাজিনীলা পৃথিবীর শিয়রের কাছে নত হয়ে পড়্‌ল। কানে কানে বল্‌লে, "আমি তোমারি।"

পৃথিবী বল্‌লে, "সে কেমন করে হবে? তুমি যে অসীম, আমি যে ছোট।"

আকাশ বল্‌লে, "আমি ত চারদিকে আমার মেঘের সীমা টেনে দিয়েছি।"

পৃথিবী বল্‌লে, "তোমার যে কত জ্যোতিষ্কের সম্পদ, আমার ত আলোর সম্পদ নেই।"

আকাশ বল্‌লে, "আজ আমি আমার চন্দ্র সূর্য্য তারা সব হারিয়ে ফেলে এসেচি, আজ আমার একমাত্র তুমি আছ।"

পৃথিবী বল্‌লে, "আমার অশ্রুভরা হৃদয় হাওয়ায় হাওয়ায় চঞ্চল হয়ে কাঁপে, তুমি যে অবিচলিত।"

আকাশ বল্‌লে, "আমার অশ্রুও আজ চঞ্চল হয়েচে দেখ্‌তে কি পাও নি? আমার বক্ষ আজ শ্যামল হ'ল তোমার ঐ শ্যামল হৃদয়টির মত।"

সে এই বলে' আকাশ-পৃথিবীর মাঝখানকার চির-বিরহটাকে চোখের জলের গান দিয়ে ভরিয়ে দিলে।

৫

সেই আকাশ-পৃথিবীর বিবাহ-মন্ত্র-গুঞ্জন নিয়ে নববর্ষা নামুক আমাদের বিচ্ছেদের পরে। প্রিয়ার মধ্যে যা অনির্ব্বচনীয় তাই হঠাৎ-বেজে-ওঠা বীণার তারের মত

চকিত হয়ে উঠুক। সে আপন সিঁথির পরে তুলে দিক্ দূর বনান্তের রংটির মত তার নীলাঞ্চল। তার কালো চোখের চাহনিতে মেঘমল্লারের সব মিড়্গুলি আর্ত্ত হয়ে উঠুক। সার্থক হোক্ বকুলমালা তার বেণীর বাঁকে বাঁকে জড়িয়ে উঠে।

যখন ঝিল্লির ঝঙ্কারে বেণুবনের অন্ধকার থর্ থর্ কর্‌চে, যখন বাদল-হাওয়ায় দীপশিখা কেঁপে কেঁপে নিবে গেল, তখন সে তার অতি-কাছের ঐ সংসারটাকে ছেড়ে দিয়ে আসুক, ভিজে ঘাসের গন্ধে ভরা বনপথ দিয়ে, আমার নিভৃত হৃদয়ের নিশীথ রাত্রে।

বাঁশি

বাঁশির বাণী চিরদিনেব বাণী—শিবের জটা থেকে গঙ্গার ধারা—প্রতিদিনের মাটির বুক বেয়ে চলেচে; অমরাবতীর শিশু নেমে এল মর্ত্ত্যের ধুলি নিয়ে স্বর্গ-স্বর্গ খেলতে

পথেব ধারে দাঁড়িয়ে বাঁশি শুনি আর মন যে কেমন করে বুঝতে পারি নে। সেই ব্যথাকে চেনা সুখ-দুঃখের সঙ্গে মেলাতে যাই, মেলে না। দেখি, চেনা হাসির চেয়ে সে উজ্জ্বল, চেনা চোখের জলের চেয়ে সে গভীর।

আর মনে হতে থাকে, চেনাটা সত্য নয়, অচেনাই সত্য। মন এমন সৃষ্টিছাড়া ভাব ভাবে কি করে? কথায় তার কোনো জবাব নেই।

আজ ভোরবেলাতেই উঠে শুনি, বিয়ে-বাড়িতে বাঁশি বাজ্‌চে।

বিয়ের এই প্রথম দিনের সুরের সঙ্গে প্রতিদিনের

সুরের মিল কোথায়? গোপন অতৃপ্তি, গভীর নৈরাশ্য; অবহেলা অপমান অবসাদ; তুচ্ছ কামনার কার্পণ্য, কুশ্রী নীরসতার কলহ, ক্ষমাহীন ক্ষুদ্রতার সংঘাত, অভ্যস্ত জীবনযাত্রার ধূলিলিপ্ত দারিদ্র্য—বাঁশির দৈববাণীতে এ-সব বার্ত্তার আভাস কোথায়?

গানের সুর সংসারের উপর থেকে এই সমস্ত চেনা কথার পর্দ্দা একটানে ছিঁড়ে ফেলে দিলে। চিরদিনকার বর-কনের শুভদৃষ্টি হচ্চে কোন্ রক্তাংশুকের সলজ্জ অবগুণ্ঠনতলে, তাই তার তানে তানে প্রকাশ হয়ে পড়ল।

যখন সেখানকার মালা-বদলের গান বাঁশিতে বেজে উঠ্ল তখন এখানকার এই কনেটির দিকে চেয়ে দেখ্লেম, তার গলায় সোনার হার, তার পায়ে দু'গাছি মল, সে যেন কান্নার সরোবরে আনন্দের পদ্মটির উপরে দাঁড়িয়ে।

সুরের ভিতর দিয়ে তাকে সংসারের মানুষ বলে আর চেনা গেল না। সেই চেনা ঘরের মেয়ে অচিন্ ঘরের বউ হয়ে দেখা দিলে।

বাঁশি বলে, এই কথাই সত্য।

সন্ধ্যা ও প্রভাত

এখানে নাম্‌ল সন্ধ্যা। সূর্য্যদেব, কোন্ দেশে কোন্ সমুদ্রপারে তোমার প্রভাত হ'ল?

অন্ধকারে এখানে কেঁপে উঠ্‌চে রজনীগন্ধা, বাসর-ঘরের দ্বারের কাছে অবগুণ্ঠিতা নববধূর মত; কোন্‌খানে ফুট্‌ল ভোরবেলাকার কনকচাঁপা?

জাগ্‌ল কে? নিবিয়ে দিল সন্ধ্যায় জ্বালানো দীপ, ফেলে দিল রাত্রে-গাঁথা সেঁউতিফুলের মালা।

এখানে একে একে দরজায় আগল পড়ল, সেখানে জান্‌লা গেল খুলে। এখানে নৌকো ঘাটে বাঁধা, মাঝি ঘুমিয়ে; সেখানে পালে লেগেচে হাওয়া।

ওরা পান্থশালা থেকে বেরিয়ে পড়েচে, পূবের দিকে মুখ করে চলেচে; ওদের কপালে লেগেচে সকালের আলো, ওদের পারাণীর কড়ি এখানে ফুরোয়-নি; ওদের জন্যে পথের ধারের জান্‌লায় জান্‌লায় কালো চোখের করুণ কামনা অনিমেষ চেয়ে আছে; রাস্তা

ওদের সাম্‌নে নিমন্ত্রণের রাঙা চিঠি খুলে ধরলে, বল্‌লে, "তোমাদের জন্যে সব প্রস্তুত।" ওদের হৃৎপিণ্ডে রক্তের তালে তালে জয়ভেরী বেজে উঠ্‌ল।

এখানে সবাই ধূসর আলোয় দিনের শেষ খেয়া পার হ'ল।

পান্থশালার আঙিনায় এরা কাঁথা বিছিয়েচে ; কেউ বা একলা, কারো বা সঙ্গী ক্লান্ত ; সাম্‌নের পথে কি আছে অন্ধকারে দেখা গেল না, পিছনের পথে কি ছিল কানে কানে বলাবলি করচে ; বলতে বলতে কথা বেধে যায়, তার পরে চুপ করে থাকে ; তার পরে আঙিনা থেকে উপরে চেয়ে দেখে আকাশে উঠেচে সপ্তর্ষি।

সূর্য্যদেব, তোমার বামে এই সন্ধ্যা, তোমার দক্ষিণে ঐ প্রভাত, এদের তুমি মিলিয়ে দাও। এর ছায়া ওর আলোটিকে একবার কোলে তুলে নিয়ে চুম্বন করুক, এর পূরবী ওর বিভাসকে আশীর্ব্বাদ করে চলে যাক্।

পুরোনো বাড়ি

১

অনেক কালের ধনী গরীব হয়ে গেছে, তাদেরই ঐ বাড়ি।

দিনে দিনে ওর উপরে দুঃসময়ের আঁচড় পড়চে। দেয়াল থেকে বালি খসে পড়ে, ভাঙা মেঝে নখ দিয়ে খুঁড়ে চড়ুই পাখী ধূলোয় পাখা ঝাপট দেয়, চণ্ডীমণ্ডপে পায়রাগুলো বাদলের ছিন্ন মেঘের মত দল বাঁধ্‌ল।

উত্তর দিকের এক পাল্লা দরজা কবে ভেঙে পড়েচে কেউ খবর নিলে না। বাকি দরজাটা—শোকাতুরা বিধবার মত—বাতাসে ক্ষণে ক্ষণে আছাড় খেয়ে পড়ে, কেউ তাকিয়ে দেখে না।

তিন মহল বাড়ি। কেবল পাঁচটি ঘরে মানুষের বাস, বাকি সব বন্ধ। যেন পঁচাশি বছরের বুড়ো, তার জীবনের সবখানি জুড়ে সেকালের কুলুপ-লাগানো স্মৃতি;—কেবল একখানিতে একালের চলাচল।

বালি-খসা ইঁট-বের-করা বাড়িটা তালি-দেওয়া কাঁথা-পরা উদাসীন পাগ্‌লার মত রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে, আপনাকেও দেখে না, অন্যকেও না।

২

একদিন ভোর রাত্রে ঐদিকে মেয়ের গলায় কান্না উঠ্‌ল। শুনি, বাড়ির যেটি শেষ ছেলে, সখের যাত্রায় রাধিকা সেজে যার দিন চল্‌ত, সে আজ আঠারো বছরে মারা গেল।

ক'দিন মেয়েরা কাঁদ্‌ল, তার পরে তাদের আর খবর নেই।

তার পরে সকল দরজাতেই তালা পড়্‌ল।

কেবল উত্তর দিকের সেই একখানা অনাথা দরজা ভাঙেও না, বন্ধও হয় না; ব্যথিত হৃৎপিণ্ডের মত বাতাসে ধড়াস্ ধড়াস্ করে আছাড় খায়।

৩

একদিন সেই বাড়িতে বিকেলে ছেলেদের গোলমাল শোনা গেল।

দেখি, বারান্দা থেকে লালপেড়ে শাড়ি ঝুল্‌চে।

অনেকদিন পরে বাড়ির এক অংশে ভাড়াটে এসেচে। তার মাইনে অল্প, ছেলেমেয়ে বিস্তর। শ্রান্ত মা বিরক্ত হয়ে তাদের মারে, তারা মেঝেতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদে।

একটা আধা-বয়সী দাসী সমস্ত দিন খাটে, আর গৃহিণীর সঙ্গে ঝগড়া করে ; বলে "চল্লুম", কিন্তু যায় না।

৪

বাড়ির এই ভাগটায় রোজ একটু আধটু মেরামত চল্‌চে।

ফাটা সাসির উপর কাগজ আঁটা হ'ল ; বারান্দায় রেলিঙের ফাঁকগুলোতে বাঁখারি বেঁধে দিলে ; শোবার ঘরে ভাঙা জান্‌লা ইঁট দিয়ে ঠেকিয়ে রাখ্‌লে ; দেয়ালে চুনকাম হ'ল, কিন্তু কালো ছাপগুলোর আভাস ঢাকা পড়ল না।

ছাদে আল্‌সের পরে গামলায় একটা রোগা পাতা-বাহারের গাছ হঠাৎ দেখা দিয়ে আকাশের কাছে লজ্জা পেলে। তার পাশেই ভিৎ ভেদ করে অশথ গাছটি সিধে দাঁড়িয়ে ; তার পাতাগুলো এদের দেখে যেন খিল্ খিল্ করে হাস্‌তে লাগ্‌ল।

মস্ত ধনের মস্ত দারিদ্র্য। তাকে ছোট হাতের ছোট কৌশলে ঢাকা দিতে গিয়ে তার আবরু গেল।

কেবল উত্তর দিকের উজাড় ঘরটির দিকে কেউ তাকায়নি। তার সেই জোড়-ভাঙা দরজা আজো কেবল বাতাসে আছ্‌ড়ে পড়চে—হতভাগার বুক-চাপ্‌ড়ানির মত।

গলি

আমাদের এই শান-বাঁধানো গলি, বারে বারে ডাইনে বাঁয়ে এঁকে বেঁকে একদিন কি যেন খুঁজ্‌তে বেরিয়েছিল। কিন্তু সে যেদিকেই যায় ঠেকে যায়। এদিকে বাড়ি, ওদিকে বাড়ি, সাম্‌নে বাড়ি।

উপরের দিকে যেটুকু নজর চলে তাতে সে এক-খানি আকাশের রেখা দেখ্‌তে পায়—ঠিক তার নিজেরই মত সরু, তার নিজেরই মত বাঁকা।

সেই ছাঁটা আকাশটাকে জিজ্ঞাসা করে, "বল ত, দিদি, তুমি কোন্ নীল সহরের গলি?"

দুপুরবেলায় কেবল একটু খনের জন্যে সে সূর্য্যকে দেখে আর মনে মনে বলে, "কিচ্ছুই বোঝা গেল না!"

বর্ষামেঘের ছায়া দুই সার বাড়ির মধ্যে ঘন হয়ে ওঠে, কে যেন গলির খাতা থেকে তার আলোটাকে পেন্সিলের আঁচড় দিয়ে কেটে দিয়েচে। বৃষ্টির ধারা শানের উপর দিয়ে গড়িয়ে চলে, বর্ষা ডমরু বাজিয়ে যেন সাপ খেলাতে থাকে। পিছল হয়, পথিকদের ছাতায় ছাতায় বেধে যায়, ছাদের উপর থেকে ছাতার উপরে হঠাৎ নালার জল লাফিয়ে পড়ে' চম্‌কিয়ে দিতে থাকে।

গলিটা অভিভূত হয়ে বলে, "ছিল খট্‌খটে শুক্‌নো, কোনো বালাই ছিল না। কিন্তু কেন অকারণে এই ধারাবাহী উৎপাত?"

ফাল্গুনে দক্ষিণের হাওয়াকে গলির মধ্যে লক্ষ্মীছাড়ার মত দেখ্‌তে হয়; ধূলো আর ছেঁড়া কাগজগুলো এলোমেলো উড়্‌তে থাকে। গলি হতবুদ্ধি হয়ে বলে, "এ কোন্ পাগ্‌লা দেবতার মাৎলামি!"

তার ধারে ধারে প্রতিদিন যে-সব আবর্জ্জনা এসে জমে—মাছের আঁশ, চুলোর ছাই, তরকারীর খোসা, মরা ইঁদুর—সে জানে এই সব হচ্চে বাস্তব। কোনো-দিন ভুলেও ভাবে না, "এ সমস্ত কেন?"

অথচ শরতের রোদ্দুর যখন উপরের বারান্দায় আড় হয়ে পড়ে, যখন পূজোর নহবৎ ভৈরবীতে বাজে, তখন ক্ষণকালের জন্যে তার মনে হয়, "এই শান-বাঁধা লাইনের বাইরে মস্ত একটা কিছু আছে বা!"

এদিকে বেলা বেড়ে যায় ; ব্যস্ত গৃহিণীর আঁচলটার মত বাড়িগুলোর কাঁধের উপর থেকে রোদ্দুরখানা গলির ধারে খসে পড়ে ; ঘড়িতে ন'টা বাজে ; ঝি কোমরে ঝুড়ি করে বাজার নিয়ে আসে ; রান্নার গন্ধে আর ধোঁয়ায় গলি ভরে' যায় ; যারা আপিসে যায় তারা ব্যস্ত হতে থাকে।

গলি তখন আবার ভাবে, "এই শান-বাঁধা লাইনের মধ্যেই সব সত্য। আর যাকে মনে ভাব্‌চি মস্ত একটা কিছু, সে মস্ত একটা স্বপ্ন।"

একটি চাউনি

গাড়িতে ওঠ্‌বার সময় একটুখানি মুখ ফিরিয়ে সে আমাকে তার শেষ চাউনিটি দিয়ে গেছে।

এই মস্ত সংসারে ঐটুকুকে আমি রাখি কোন্‌খানে?

দণ্ডপলমুহূর্ত্ত অহরহ পা ফেল্‌বে না এমন একটু জায়গা আমি পাই কোথায়?

মেঘের সকল সোনার রঙ যে-সন্ধ্যায় মিলিয়ে যায় এই চাউনি কি সেই সন্ধ্যায় মিলিয়ে যাবে? নাগ-কেশরের সকল সোনালি রেণু যে-বৃষ্টিতে ধুয়ে যায় এও কি সেই বৃষ্টিতেই ধুয়ে যাবে?

সংসারের হাজার জিনিষের মাঝখানে ছড়িয়ে থাক্‌লে এ থাক্‌বে কেন?—হাজার কথার আবর্জ্জনায়, হাজার বেদনার স্তূপে?

তার ঐ এক চকিতের দান সংসারের আর-সমস্তকে ছাড়িয়ে আমারই হাতে এসে পৌঁছেচে। এ'কে আমি রাখ্‌ব গানে গেঁথে, ছন্দে বেঁধে ; আমি এ'কে রাখ্‌ব সৌন্দর্য্যের অমরাবতীতে।

পৃথিবীতে রাজার প্রতাপ ধনীর ঐশ্বর্য্য হয়েচে মরবারই জন্যে। কিন্তু চোখের জলে কি সেই অমৃত নেই যাতে একনিমেষের চাউনিকে চিরকাল বাঁচিয়ে রাখ্‌তে পারে ?

গানের সুর বল্‌লে, "আচ্ছা, আমাকে দাও! আমি রাজার প্রতাপকে স্পর্শ করিনে, ধনীর ঐশ্বর্য্যকেও না, কিন্তু ঐ ছোট জিনিষগুলিই আমার চিরদিনের ধন ; ঐগুলি দিয়েই আমি অসীমের গলার হার গাঁথি।"

একটি দিন

মনে পড়্চে সেই দুপুর বেলাটি। ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টিধারা ক্লান্ত হয়ে আসে, আবার দমকা হাওয়া তাকে মাতিয়ে তোলে।

ঘরে অন্ধকার, কাজে মন যায় না। যন্ত্রটা হাতে নিয়ে বর্ষার গানে মল্লারের সুর লাগালেম।

পাশের ঘর থেকে একবার সে কেবল দুয়ার পর্য্যন্ত এল। আবার ফিরে গেল। আবার একবার বাইরে এসে দাঁড়াল। তার পরে ধীরে ধীরে ভিতরে এসে বস্‌ল। হাতে তার সেলাইয়ের কাজ ছিল, মাথা নীচু করে সেলাই কর্‌তে লাগ্‌ল। তার পরে সেলাই বন্ধ করে জান্‌লার বাইরে ঝাপ্‌সা গাছগুলোর দিকে চেয়ে রইল।

বৃষ্টি ধরে এল, আমার গান থাম্‌ল। সে উঠে চুল বাঁধ্‌তে গেল।

এইটুকু ছাড়া আর কিছুই না। বৃষ্টিতে গানেতে অকাজে আঁধারে জড়ানো কেবল সেই একটি দুপুর বেলা।

ইতিহাসে রাজা-বাদসার কথা, যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী, সস্তা হয়ে ছড়াছড়ি যায়। কিন্তু একটি দুপুরবেলার ছোট একটু কথার টুক্‌রো দুর্লভ রত্নের মত কালের কৌটোর মধ্যে লুকোনো রইল, দুটি লোক তার খবর জানে।

কৃতঘ্ন শোক

ভোর বেলায় সে বিদায় নিলে।

আমার মন আমাকে বোঝাতে বস্‌ল, "সবই মায়া।"

আমি রাগ করে বল্‌লেম, "এইত টেবিলে সেলাইয়ের বাক্স, ছাতে ফুলগাছের টব, খাটের উপর নাম-লেখা হাতপাখাখানি—সবই ত সত্য।"

মন বল্‌লে, "তবু ভেবে দেখ—"

আমি বল্‌লেম, "থাম তুমি। ঐ দেখনা, গল্পের বইখানি, মাঝের পাতায় একটি চুলের কাঁটা, সবটা পড়া শেষ হয়নি; এও যদি মায়া হয়, সে এর চেয়েও বেশি মায়া হ'ল কেন?"

মন চুপ করলে। বন্ধু এসে বললেন, "যা ভালো তা সত্য, তা কখনো যায় না; সমস্ত জগৎ তাকে রত্নের মত বুকের হারে গেঁথে রাখে।"

আমি রাগ করে' বললেম, "কি করে' জানলে? দেহ কি ভালো নয়? সে দেহ গেল কোনখানে?"

ছোট ছেলে যেমন রাগ করে' মাকে মারে তেমনি করেই বিশ্বে আমার যা-কিছু আশ্রয় সমস্তকেই মারতে লাগলেম। বললেম, "সংসার বিশ্বাসঘাতক।"

হঠাৎ চমকে উঠলেম। মনে হল, কে বললে, "অকৃতজ্ঞ!"

জানলার বাইরে দেখি ঝাউগাছের আড়ালে তৃতীয়ার চাঁদ উঠচে, যে গেচে যেন তারি হাসির লুকোচুরি। তারা-ছিটিয়ে-দেওয়া অন্ধকারের ভিতর থেকে একটি ভর্ৎসনা এল, "ধরা দিয়েছিলেম সেটাই কি ফাঁকি, আর আড়াল পড়েচে, এইটেকেই এত জোরে বিশ্বাস?"

সতেরো বছর

আমি তার সতেরো বছরের জানা।

কত আসা-যাওয়া, কত দেখাদেখি, কত বলাবলি ;

তারি আশেপাশে কত স্বপ্ন, কত অনুমান, কত ইসারা ; তারি সঙ্গে সঙ্গে কখনো বা ভোরের ভাঙাঘুমে শুকতারার আলো, কখনো বা আষাঢ়ের ভর-সন্ধ্যায় চামেলি ফুলের গন্ধ, কখনো বা বসন্তের শেষ প্রহরে ক্লান্ত নহবতের পিলু-বারোয়াঁ, সতেরো বছর ধরে' এই সব গাঁথা পড়েছিল তার মনে।

আর তারি সঙ্গে মিলিয়ে সে আমার নাম ধরে ডাক্‌ত। ঐ নামে যে-মানুষ সাড়া দিত সেত একা বিধাতার রচনা নয়। সে যে তারই সতেরো বছরের জানা দিয়ে গড়া ; কখনো আদরে কখনো অনাদরে, কখনো কাজে কখনো অকাজে, কখনো সবার সাম্‌নে কখনো একলা আড়ালে, কেবল একটি লোকের মনে-মনে জানা দিয়ে গড়া সেই মানুষ।

তার পরে আরো সতেরো বছর যায়। কিন্তু এর দিনগুলি এর রাতগুলি সেই নামের রাখি-বন্ধনে আর ত এক হয়ে মেলে না,—এরা ছড়িয়ে পড়ে।

তাই এরা রোজ আমাকে জিজ্ঞাসা করে, "আমরা থাক্‌ব কোথায়? আমাদের ,ডেকে নিয়ে ঘিরে রাখ্‌বে কে?"

আমি তার কোনো জবাব দিতে পারিনে, চুপ করে বসে থাকি আর ভাবি। আর ওরা বাতাসে উড়ে চলে যায়। বলে, "আমরা খুঁজতে বেরলেম।"

"কা'কে?"

কা'কে সে এরা জানে না। তাই কখনো যায় এদিকে, কখনো যায় ওদিকে; সন্ধ্যাবেলাকার খাপ-ছাড়া মেঘের মত অন্ধকারে পাড়ি দেয়, আর দেখ্‌তে পাইনে।

প্রথম শোক

বনের ছায়াতে যে পথটি ছিল, সে আজ ঘাসে ঢাকা।

সেই নির্জ্জনে হঠাৎ পিছন থেকে কে বলে উঠ্‌ল, "আমাকে চিনতে পার না?"

আমি ফিরে তার মুখের দিকে তাকালেম। বল্‌লেম, "মনে পড়চে, কিন্তু ঠিক নাম করতে পারচিনে।"

সে বল্‌লে, "আমি তোমার সেই অনেক কালের, সেই পঁচিশ বছর বয়সের শোক।"

তার চোখের কোণে একটু ছলছলে আভা দেখা দিলে, যেন দিঘির জলে চাঁদের রেখা।

অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেম। বল্‌লেম, "সেদিন

তোমাকে শ্রাবণের মেঘের মত কালো দেখেছি, আজ যে দেখি আশ্বিনের সোনার প্রতিমা। সেদিনকার সব চোখের জল কি হারিয়ে ফেলেচ ?”

কোনো কথাটি না বলে সে একটু হাস্‌লে ; বুঝলেম সবটুকু রয়ে গেচে ঐ হাসিতে। বর্ষার মেঘ শরতে শিউলিফুলের হাসি শিখে নিয়েচে।

আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লেম, “আমার সেই পঁচিশ বছরের যৌবনকে কি আজো তোমার কাছে রেখে দিয়েচ ?”

সে বল্‌লে “এই দেখনা আমার গলার হার।” দেখ্‌লেম, সেদিনকার বসন্তের মালার একটি পাপ্‌ড়িও খসে নি।

আমি বল্‌লেম, “আমার আর ত সব জীর্ণ হয়ে গেল, কিন্তু তোমার গলায় আমার সেই পঁচিশ বছরের যৌবন আজও ত ম্লান হয়নি।”

আস্তে আস্তে সেই মালাটি নিয়ে সে আমার গলায় পরিয়ে দিলে। বল্‌লে, “মনে আছে, সেদিন বলেছিলে তুমি সান্ত্বনা চাওনা, তুমি শোককেই চাও !”

লজ্জিত হয়ে বল্‌লেম, “বলেছিলেম। কিন্তু তার পরে অনেক দিন হয়ে গেল, তার পরে কখন ভুলে গেলেম।”

সে বললে, “যে-অন্তর্যামীর বর, তিনি ত ভোলেন

নি। আমি সেই অবধি ছায়াতলে গোপনে বসে আছি। আমাকে বরণ করে নাও।”

আমি তার হাতখানি আমার হাতে তুলে নিয়ে বল্‌লেম, “একি তোমার অপরূপ মূর্ত্তি!”

সে বল্‌লে, “যা ছিল শোক, আজ তাই হয়েচে শান্তি।”

প্রশ্ন

১

শ্মশান হতে বাপ ফিরে এল।

তখন সাত বছরের ছেলেটি—গা খোলা, গলায় সোনার তাবিজ,—একলা গলির উপরকার জান্‌লার ধারে।

কি ভাবচে তা সে আপ্‌নি জানেনা।

সকালের রৌদ্র সাম্‌নের বাড়ির নীম গাছটির আগডালে দেখা দিয়েছে;

কাঁচা-আমওয়ালা গলির মধ্যে এসে হাঁক দিয়ে দিয়ে ফিরে গেল।

বাবা এসে খোকাকে কোলে নিলে; খোকা জিজ্ঞাসা করলে, "মা কোথায়?"

বাবা উপরের দিকে মাথা তুলে বল্লে, "স্বর্গে।"

২

সে রাত্রে শোকে শ্রান্ত বাপ, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ক্ষণে ক্ষণে গুমরে উঠ্‌চে।

তুয়ারে লণ্ঠনের মিট্‌মিটে আলো, দেয়ালের গায়ে একজোড়া টিক্‌টিকি।

সাম্‌নে খোলা ছাদ, কখন্ খোকা সেইখানে এসে দাঁড়াল।

চারিদিকে আলো-নেবানো বাড়িগুলো যেন দৈত্য-পুরীর পাহারা-ওয়ালা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমচ্চে।

উলঙ্গগায়ে খোকা আকাশের দিকে তাকিয়ে।

তার দিশাহারা মন কাকে জিজ্ঞাসা করচে, "কোথায় স্বর্গের রাস্তা ?"

আকাশে তার কোনো সাড়া নেই ;

কেবল তারায় তারায় বোবা অন্ধকারের চোখের জল।

গল্প

১

ছেলেটির যেম্‌নি কথা ফুট্‌ল অম্‌নি সে বল্‌লে, "গল্প বল !"

দিদিমা বল্‌তে সুরু কর্‌লেন, "এক রাজপুত্তুর, কোটালের পুত্তুর, সদাগরের পুত্তুর—"

গুরুমশায় হেঁকে বল্‌লেন, "তিন-চারে বারো।"

কিন্তু তখন তার চেয়ে বড় হাঁক দিয়েচে রাক্ষসটা, "হাঁউ মাউ খাঁউ—" নাম্‌তার হুঙ্কার ছেলেটার কানে পৌঁছয় না।

যারা হিতৈষী তারা ছেলেকে ঘরে বন্ধ করে গম্ভীর স্বরে বল্‌লে, "তিন-চারে বারো এটা হল সত্য, আর রাজপুত্তুর, কোটালের পুত্তুর, সওদাগরের পুত্তুর—ওটা হল মিথ্যে, অতএব—"

ছেলেটির মন তখন সেই মানসচিত্রের সমুদ্র পেরিয়ে গেছে, মানচিত্রে যার ঠিকানা মেলে না; তিন-চারে বারো তার পিছে-পিছে পাড়ি দিতে যায়, কিন্তু সেখানে ধারাপাতের হালে পানি পায় না।

হিতৈষী মনে করে, নিছক দুষ্টমি, বেতের চোটে শোধন করা চাই।

দিদিমা গুরুমশায়ের গতিক দেখে চুপ। কিন্তু আপদ বিদায় হতে চায় না, এক যায় ত আর আসে। কথক এসে আসন জুড়ে বস্‌লেন। তিনি সুরু করে দিলেন এক রাজপুত্রের বনবাসের কথা।

যখন রাক্ষসীর নাক-কাটা চল্‌চে তখন হিতৈষী বল্‌লেন, ইতিহাসে এর কোনো প্রমাণ নেই; যার প্রমাণ পথে ঘাটে, হসে চ্চে তিন-চারে বারো।

ততক্ষণে হনুমান লাফ দিয়েচে আকাশে, অত ঊর্দ্ধে ইতিহাস তার সঙ্গে কিছুতেই পাল্লা দিতে পারে না। পাঠশালা থেকে ইস্কুলে, ইস্কুল থেকে কলেজে ছেলের মনকে পুটপাকে শোধন করা চল্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু যতই চোলাই করা যাক্‌, ঐ কথাটুকু কিছুতেই মর্‌তে চায় না, "গল্প বল।"

২

এর থেকে দেখা যায়, শুধু শিশুবয়সে নয়, সকল বয়সেই মানুষ গল্পপোষ্য জীব। তাই পৃথিবী জুড়ে মানুষের ঘরে ঘরে, যুগে যুগে, মুখে মুখে, লেখায় লেখায় গল্প যা জমে উঠেচে তা মানুষের সকল সঞ্চয়কেই ছাড়িয়ে গেচে।

হিতৈষী একটা কথা ভালো করে ভেবে দেখে না, গল্প রচনার নেশাই হচ্চে সৃষ্টিকর্ত্তার সব-শেষের নেশা; তাঁকে শোধন কর্‌তে না পার্‌লে মানুষকে শোধন করার আশা করা যায় না।

একদিন তিনি তাঁর কার্‌খানা-ঘরে আগুন থেকে জল, জল থেকে মাটি গড়্‌তে লেগে গিয়েছিলেন। সৃষ্টি তখন গলদ্‌ঘর্ম্ম, বাষ্পভারাকুল। ধাতু-পাথরের পিণ্ডগুলো তখন থাকে থাকে গাঁথা হচ্চে;—চারদিকে মালমসলা ছড়ানো আর দমাদম পিটনি। সেদিন বিধাতাকে দেখ্‌লে কোনোমতে মনে করা যেতে পার্‌ত না যে তাঁর মধ্যে কোথাও কিছু ছেলেমানুষী আছে। তখনকার কাণ্ডকার্‌খানা যাকে বলে "সারবান্।"

তারপরে কখন্ সুরু হল প্রাণের পত্তন। জাগ্‌ল ঘাস, উঠ্‌ল গাছ, ছুট্‌ল পশু, উড়্‌ল পাখী। কেউবা মাটিতে বাঁধা থেকে আকাশে অঞ্জলি পেতে দাঁড়াল, কেউবা ছাড়া পেয়ে পৃথিবীময় আপনাকে বহুধা বিস্তার করে চল্‌ল, কেউ বা জলের যবনিকাতলে নিঃশব্দনৃত্যে পৃথিবী প্রদক্ষিণ কর্‌তে ব্যস্ত, কেউবা আকাশে ডানা মেলে সূর্য্যালোকের বেদীতলে গানের অর্ঘ্যরচনায় উৎসুক। এখন থেকেই ধরা পড়্‌তে লাগল বিধাতার মনের চাঞ্চল্য।

এমন করে বহু যুগ কেটে যায়। হঠাৎ এক সময়ে কোন্ খেয়ালে সৃষ্টিকর্ত্তার কার্‌খানায় ঊনপঞ্চাশ পবনের তলব পড়্‌ল। তাদের সব-ক'টাকে নিয়ে তিনি মানুষ গড়্‌লেন। এতদিন পরে আরম্ভ হল তাঁর গল্পের পালা। বহুকাল কেটেচে তাঁর বিজ্ঞানে, কারু-শিল্পে; এইবার তাঁর সুরু হল সাহিত্য।

মানুষকে তিনি গল্পে গল্পে ফুটিয়ে তুল্‌তে লাগ্‌লেন। পশুপাখীর জীবন হল আহার নিদ্রা সন্তানপালন; মানুষের জীবন হল গল্প। কত বেদনা, কত ঘটনা; সুখদুঃখ রাগবিরাগ ভালোমন্দের কত ঘাতপ্রতিঘাত! ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার, একের সঙ্গে দশের, সাধনার সঙ্গে স্বভাবের, কামনার সঙ্গে ঘটনার সংঘাতে কত আবর্ত্তন! নদী যেমন জলস্রোতের ধারা, মানুষ তেমনি গল্পের প্রবাহ। তাই পরস্পর দেখা হতেই প্রশ্ন এই, "কি হল হে, কি খবর, তার পরে?" এই "তার-পরের" সঙ্গে "তার-পরে" বোনা হয়ে পৃথিবী জুড়ে মানুষের গল্প গাঁথা হচ্চে। তাকেই বলি জীবনের কাহিনী, তাকেই বলি মানুষের ইতিহাস।

বিধাতার রচা ইতিহাস আর মানুষের রচা কাহিনী এই দুই কথায় মিলে মানুষের সংসার। মানুষের পক্ষে কেবল যে অশোকের গল্প, আক্‌বরের গল্পই সত্য তা নয়; যে-রাজপুত্র সাত-সমুদ্র-পারে সাতরাজার-ধন-

মাণিকের সন্ধানে চলে সেও সত্য; আর সেই ভক্তিবিমুগ্ধ হনুমানের সরল বীরত্বের কথাও সত্য যে-হনুমান গন্ধমাদনকে উৎপাটিত করে আন্‌তে সংশয় বোধ করে না। এই মানুষের পক্ষে আরঙ্গেব যেমন সত্য, দুর্য্যোধনও তেমনি সত্য। কোন্‌টার প্রমাণ বেশী, কোন্‌টার প্রমাণ কম সে হিসাবে নয়, কেবল গল্প হিসাবে কোন্‌টা খাঁটি, সেইটেই তার পক্ষে সবচেয়ে সত্য।

মানুষ বিধাতার সাহিত্য-লোকেই মানুষ—সুতরাং না সে বস্তুতে গড়া, না তত্ত্বে—অনেক চেষ্টা করে' হিতৈষী কোনমতেই এই কথা মানুষকে ভোলাতে পারলে না। অবশেষে হয়রান হয়ে হিতকথার সঙ্গে গল্পের সন্ধি-স্থাপন করতে সে চেষ্টা করে, কিন্তু চিরকালের স্বভাবদোষে কিছুতে জোড়া মেলাতে পারে না। তখন গল্পও যায় কেটে হিতকথাও পড়ে খসে, আবর্জ্জনা জমে ওঠে।

মীনু

১

মীনু পশ্চিমে মানুষ হয়েচে। ছেলেবেলায় ইঁদারার ধারে তুঁতের গাছে লুকিয়ে ফল পাড়তে যেত; আর অড়র-ক্ষেতে যে বুড়ো মালী ঘাস নিড়োত তার সঙ্গে ওর ছিল ভাব।

বড় হয়ে জৌনপুরে হল ওর বিয়ে। একটি ছেলে হয়ে মারা গেল, তার পরে ডাক্তার বল্‌লে, "এও বাঁচে কি না বাঁচে।"

তখন তাকে কলকাতায় নিয়ে এল।

ওর অল্প বয়েস। কাঁচা ফলটির মত ওর কাঁচা প্রাণ পৃথিবীর বোঁটা শক্ত করে আঁকৃড়ে ছিল। যা-কিছু কচি, যা-কিছু সবুজ, যা-কিছু সজীব তার পরেই ওর বড় টান।

আঙিনায় তার আট-দশ হাত জমি, সেইটুকুতে তার বাগান।

এই বাগানটি ছিল যেন তার কোলের ছেলে।

তারি বেড়ার পরে যে ঝুম্‌কো লতা লাগিয়েছিল এইবার সেই লতায় কুঁড়ির আভাস দিতেই সে চলে এসেচে।

পাড়ার সমস্ত পোষা এবং না-পোষা কুকুরের অন্ন আর আদর ওরই বাড়িতে। তাদের মধ্যে সব-চেয়ে যেটিকে সে ভালবাসত তার নাক ছিল খাঁদা, তার নাম ছিল ভোঁতা।

তারই গলায় পরাবে বলে মীনু রঙীন পুঁতির মালা গাঁথতে বসেছিল। সেটা শেষ হল না। যার কুকুর সে বল্‌লে, "বৌ-দিদি, এটিকে তুমি নিয়ে যাও।"

মীনুর স্বামী বল্‌লে, "বড় হাঙ্গাম, কাজ নেই।"

২

কলকাতার বাসায় দোতলার ঘরে মীনু শুয়ে থাকে। হিন্দুস্থানী দাই কাছে বসে কত কি বকে; সে খানিক শোনে, খানিক শোনে না।

একদিন সারারাত মীনুর ঘুম ছিল না। ভোরের আঁধার একটু যেই ফিকে হল সে দেখ্‌তে পেলে তার জান্‌লার নীচেকার গোলক-চাঁপার গাছটি ফুলে ভরে উঠেচে। তার একটু মৃদু গন্ধ মীনুর জানলার কাছটিতে এসে যেন জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কেমন আছ?"

ওদের বাসা আর পাশের বাড়িটার অল্প একটু-খানি ফাঁকের মধ্যে ঐ রৌদ্রের কাঙাল গাছটি, বিশ্বপ্রকৃতির এই হাবা ছেলে, কেমন-করে' এসে পড়ে' যেন বিভ্রান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ক্লান্ত মীনু বেলায় উঠ্‌ত। উঠেই সেই গাছটির দিকে চেয়ে দেখ্‌ত সেদিনের মত আর ত তেমন ফুল দেখা যায় না। দাইকে বলত, "আহা দাই, মাথা খা, এই গাছের তলাটি খুঁড়ে দিয়ে রোজ একটু জল দিস্!"

এই গাছে কেন যে ক'দিন ফুল দেখা যায় নি একটু পরেই বোঝা গেল।

সকালের আলো তখন আধ-ফোটা পদ্মের মত সবে জাগ্‌চে এমন সময় সাজি-হাতে পূজারি ব্রাহ্মণ গাছটাকে ঝাঁকানি দিতে লাগ্‌ল, যেন খাজনা আদায়ের জন্যে বর্গির পেয়াদা।

মীনু দাইকে বল্‌লে, "শীঘ্র, ঐ ঠাকুরকে একবার ডেকে আন্।"

ব্রাহ্মণ আস্‌তেই মীনু তাকে প্রণাম করে বল্লে, "ঠাকুর, ফুল নিচ্চ কার জন্যে?"

ব্রাহ্মণ বল্‌লে, "দেবতার জন্যে।"

মীনু বল্‌লে, "দেবতা ত ঐ ফুল স্বয়ং আমাকে পাঠিয়েচেন।"

"তোমাকে ?"

"হাঁ, আমাকে। তিনি যা দিয়েছেন সে ত ফিরিয়ে নেবেন বলে দেন নি।"

ব্রাহ্মণ বিরক্ত হয়ে চলে গেল।

পরের দিন ভোরে আবার সে যখন গাছ-নাড়া দিতে সুরু করলে তখন মীনু তার দাইকে বললে, "ও দাই, এ ত আমি চোখে দেখতে পারিনে। পাশের ঘরের জানলার কাছে আমার বিছানা করে দে !"

৩

পাশের ঘরের জানলার সামনে রায়চৌধুরীদের চৌতলা বাড়ি। মীনু তার স্বামীকে ডাকিয়ে এনে বললে. "ঐ দেখ. দেখ, ওদের কি সুন্দর ছেলেটি ! ওকে একটিবার আমার কোলে এনে দাও না !"

স্বামী বললে, "গরীবের ঘরে ছেলে পাঠাবে কেন ?"

মীনু বললে. "শোন একবার ! ছোট ছেলের বেলায় কি ধনী-গরীবের ভেদ আছে ? সবার কোলেই ওদের রাজ-সিংহাসন।"

স্বামী ফিরে এসে খবর দিলে, "দরোয়ান বললে বাবুর সঙ্গে দেখা হবে না।"

পরের দিন বিকেলে মীনু দাইকে ডেকে বললে,

"ঐ চেয়ে দেখ্, বাগানে একলা বসে খেলচে। দৌড়ে যা, ওর হাতে এই সন্দেশটি দিয়ে আয়!"

সন্ধ্যাবেলায় স্বামী এসে বল্লে, "ওরা রাগ করেছে।"

"কেন, কি হয়েচে?"

"ওরা বলেচে, দাই যদি ওদের বাগানে যায় ত পুলিসে ধরিয়ে দেবে।"

এক মুহূর্ত্তে মীনুর দুই চোখ জলে ভেসে গেল। সে বল্লে "আমি দেখেচি দেখেচি, ওর হাত থেকে ওরা আমার সন্দেশ ছিনিয়ে নিলে। নিয়ে ওকে মার্লে! এখানে আমি বাঁচব না। আমাকে নিয়ে যাও!"

নামের খেলা

১

প্রথম বয়সেই সে কবিতা লিখ্‌তে সুরু করে।

বহু যত্নে খাতায় সোনালী কালীর কিনারা টেনে তারি গায়ে লতা এঁকে মাঝখানে লাল কালী দিয়ে কবিতাগুলি লিখে রাখ্‌ত। আর খুব সমারোহে মলাটের উপর লিখ্‌ত, শ্রীকেদারনাথ ঘোষ।

একে একে লেখাগুলিকে কাগজে পাঠাতে লাগ্‌ল। কোথাও ছাপা হ'ল না।

মনে মনে সে স্থির কর্‌লে, যখন হাতে টাকা জম্‌বে তখন নিজে কাগজ বের কর্‌বে।

বাপের মৃত্যুর পর গুরুজনেরা বার বার বল্‌লে, "একটা কোনো কাজের চেষ্টা কর, কেবল লেখা নিয়ে সময় নষ্ট কোরো না।"

সে একটুখানি হাস্‌লে আর লিখ্‌তে লাগ্‌ল। একটি দুটি তিনটি বই সে পরে পরে ছাপালে।

এই নিয়ে খুব আন্দোলন হবে আশা করেছিল। হ'ল না।

২

আন্দোলন হ'ল একটি পাঠকের মনে। সে হচ্চে, তার ছোট ভাগনেটি।

নতুন ক খ শিখে সে যে-বই হাতে পায় চেঁচিয়ে পড়ে।

একদিন একখানা বই নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে মামার কাছে ছুটে এল। বল্‌লে, "দেখ দেখ, মামা, এ যে তোমারি নাম।"

মামা একটুখানি হাস্‌লে আর আদর ক'রে খোকার গাল টিপে দিলে।

মামা তার বাক্স খুলে আর-একখানি বই বের করে' বল্‌লে, "আচ্ছা, এটা পড় দেখি।"

ভাগ্‌নে একটি একটি অক্ষর বানান করে' করে' মামার নাম পড়্‌ল। বাক্স থেকে আরও একটা বই বেরল, সেটাতেও পড়ে' দেখে, মামার নাম!

পরে পরে যখন তিনটি বইয়ে মামার নাম দেখ্‌লে, তখন সে আর অল্পে সন্তুষ্ট হ'তে চাইল না। দুই হাত ফাঁক ক'রে' জিজ্ঞেস করলে, "তোমার নাম আরো অনেক অনেক অনেক বইয়ে আছে; একশোটা, চব্বিশটা, সাতটা বইয়ে?"

মামা চোখ টিপে বল্‌লে, "ক্রমে দেখ্‌তে পাবি।"

ভাগ্‌নে বই তিনটে নিয়ে লাফাতে লাফাতে বাড়ির বুড়ি ঝিকে দেখাতে নিয়ে গেল।

৩

ইতিমধ্যে মামা একখানা নাটক লিখেছে। ছত্রপতি শিবাজী তার নায়ক।

বন্ধুরা বল্‌লে,"এ নাটক নিশ্চয় থিয়েটারে চল্‌বে।"

সে মনে মনে স্পষ্ট দেখ্‌তে লাগ্‌ল, রাস্তায় রাস্তায় গলিতে গলিতে তার নিজের নামে আর নাটকের নামে যেন শহরের গায়ে উল্কি পরিয়ে দিয়েছে।

আজ রবিবার। তার থিয়েটার-বিলাসী বন্ধু থিয়েটার-ওয়ালাদের কাছে অভিমত আন্‌তে গেছে। তাই সে পথ চেয়ে রইল।

রবিবারে তার ভাগ্‌নেরও ছুটি। আজ সকাল থেকে সে এক খেলা বের করেছে, অন্যমনস্ক হ'য়ে মামা তা লক্ষ্য করে নি।

ওদের ইস্কুলের পাশে ছাপাখানা আছে। সেখান থেকে ভাগ্‌নে নিজের নামের কয়েকটা সীসের অক্ষর জুটিয়ে এনেছে। তার কোনোটা ছোট, কোনোটা বড়।

যে-কোনো বই পায় এই সীসের অক্ষরে কালী লাগিয়ে তাতে নিজের নাম ছাপাচ্ছে। মামাকে আশ্চর্য্য ক'রে দিতে হবে।

৪

আশ্চর্য্য করে দিলে। মামা এক সময়ে বস্‌বার ঘরে এসে দেখে, ছেলেটি ভারী ব্যস্ত।

কি কানাই কি কর্‌ছিস্?

ভাগ্‌নে খুব আগ্রহ করে'ই দেখালে সে কি কর্‌চে। কেবল তিনটি মাত্র বই নয়, অন্ততঃ পঁচিশখানা বইয়ে ছাপার অক্ষরে কানাইয়ের নাম!

এ কি-কাণ্ড! পড়া-শুনোর নাম নেই, ছোঁড়াটার কেবল খেলা! আর এ কি-রকম খেলা!

কানাইয়ের বহু-দুঃখে-জোটানো নামের অক্ষরগুলি হাত থেকে সে ছিনিয়ে নিলে।

কানাই শোকে চীৎকার করে' কাঁদে, তার পরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে, তার পরে থেকে থেকে দম্‌কায় দম্‌কায় কেঁদে ওঠে, কিছুতেই সান্ত্বনা মানে না।

বুড়ি ঝি ছুটে এসে জিজ্ঞেস কর্‌লে, "কি হ'য়েছে, বাবা?"

কানাই বল্‌লে,"আমার নাম।"

মা এসে বল্‌লে, "কি রে কানাই, কি হয়েছে?"

কানাই রুদ্ধকণ্ঠে বল্‌লে,"আমার নাম।"

ঝি লুকিয়ে তার হাতে আস্ত একটি ক্ষীরপুলি এনে দিলে, মাটিতে ফেলে দিয়ে সে বল্‌লে,"আমার নাম!"

মা এসে বল্‌লে, "কানাই, এই নে তোর সেই রেলগাড়ীটা।"

কানাই রেলগাড়ী ঠেলে ফেলে বল্‌লে, "আমার নাম।"

থিয়েটার থেকে বন্ধু এল।

মামা দরজার কাছে ছুটে গিয়ে জিজ্ঞেস কর্‌লে, "কি হ'ল ?"

বন্ধু বল্‌লে, "ওরা রাজী হ'ল না।

অনেকক্ষণ চুপ করে' থেকে মামা বল্‌লে, "আমার সর্ব্বস্ব যায় সেও ভাল, আমি নিজে থিয়েটার খুল্‌ব।"

বন্ধু বল্‌লে, "আজ ফুটবল ম্যাচ দেখ্‌তে যাবে না ?"

ও বল্‌লে, "না, আমার জ্বরভাব।"

বিকেলে মা এসে বল্‌লে. "খাবার ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল।"

ও বল্‌লে, "ক্ষিদে নেই !

সন্ধ্যের সময় স্ত্রী এসে বল্‌লে. "তোমার সেই নতুন লেখাটা শোনাবে না ?"

ও বল্‌লে, "মাথা ধরেচে !"

ভাগ্‌নে এসে বল্‌লে, "আমার নাম ফিরিয়ে দাও !"

মামা ঠাস্‌ করে' তার গালে এক চড় কষিয়ে দিলে।

ভুল স্বর্গ

১

লোকটি নেহাৎ বেকার ছিল।

তার কোনো কাজ ছিল না, কেবল সখ ছিল নানা রকমের।

ছোট ছোট কাঠের চৌকোয় মাটি ঢেলে তার উপরে সে ছোট ছোট ঝিনুক সাজাত। দূর থেকে দেখে মনে হত—যেন একটা এলোমেলো ছবি, তার মধ্যে পাখীর ঝাঁক; কিম্বা এব্ড়ো খেব্ড়ো মাঠ, সেখানে গোরু চর্‌চে; কিম্বা উঁচু নীচু পাহাড়, তার গা দিয়ে ওটা বুঝি ঝর্‌না হবে, কিম্বা পায়ে চলা পথ।

বাড়ীর লোকের কাছে তার লাঞ্ছনার সীমা ছিল না। মাঝে মাঝে পণ করত পাগ্‌লামি ছেড়ে দেবে, কিন্তু পাগ্‌লামি তাকে ছাড়্‌ত না।

২

কোনো কোনো ছেলে আছে সারা বছর পড়ায় ফাঁকি দেয় অথচ পরীক্ষায় খামকা পাস করে ফেলে। এর সেই দশা হল।

সমস্ত জীবনটা অকাজে গেল অথচ মৃত্যুর পরে খবর পেলে যে, তার স্বর্গে যাওয়া মঞ্জুর।

কিন্তু নিয়তি স্বর্গের পথেও মানুষের সঙ্গ ছাড়ে না। দূতগুলো মার্কা ভুল করে' তাকে কেজো লোকের স্বর্গে রেখে এল।

এই স্বর্গে আর সবই আছে, কেবল অবকাশ নেই।

এখানে পুরুষরা বল্‌চে, "হাঁফ ছাড়্‌বার সময় কোথা?" মেয়েরা বল্‌চে, "চল্‌লুম ভাই, কাজ রয়েচে পড়ে।" সবাই বলে, "সময়ের মূল্য আছে"; কেউ বলে না. "সময় অমূল্য।" "আর ত পারা যায় না" বলে' সবাই আক্ষেপ করে, আর ভারি খুসি হয়। "খেটে খেটে হয়রান হলুম" এই নালিশটাই সেখানকার সঙ্গীত।

এ বেচারা কোথাও ফাঁক পায় না, কোথাও খাপ খায় না। রাস্তায় অন্যমনস্ক হয়ে চলে, তাতে ব্যস্ত লোকের পথ আটক করে। চাদরটি পেতে যেখানেই আরাম করে' বস্‌তে চায় শুন্‌তে পায় সেখানেই

ফসলের ক্ষেত, বীজ পোঁতা হয়ে গেচে। কেবলি উঠে যেতে হয়, সরে' যেতে হয়।

৩

ভারি এক ব্যস্ত মেয়ে স্বর্গের উৎস থেকে রোজ জল নিতে আসে।

পথের উপর দিয়ে সে চলে' যায় যেন সেতারের দ্রুত তালের গতের মত।

তাড়াতাড়ি সে এলো খোঁপা বেঁধে নিয়েচে। তবু দুচারটে দুরন্ত অলক কপালের উপর ঝুঁকে পড়ে' তার চোখের কালো তারা দেখ্‌বে বলে উঁকি মার্‌চে।

স্বর্গীয় বেকার মানুষটি একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল চঞ্চল ঝর্‌নার ধারে তমাল-গাছটির মত স্থির।

জান্‌লা থেকে ভিক্ষুককে দেখে রাজকন্যার যেমন দয়া হয়, এ'কে দেখে মেয়েটির তেম্‌নি দয়া হল।

"আহা, তোমার হাতে বুঝি কাজ নেই!"

নিশ্বাস ছেড়ে বেকার বল্‌লে, "কাজ কর্‌ব তার সময় নেই।"

মেয়েটি ওর কথা কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লে না। বল্‌লে, "আমার হাত থেকে কিছু কাজ নিতে চাও?"

বেকার বল্‌লে, "তোমার হাত থেকেই কাজ নেব বলে দাঁড়িয়ে আছি।"

"কি কাজ দেব ?"

"তুমি যে ঘড়া কাঁখে করে' জল তুলে নিয়ে যাও তারি একটি যদি আমাকে দিতে পার।"

"ঘড়া নিয়ে কি হবে ? জল তুল্‌বে ?"

"না, আমি তার গায়ে চিত্র কর্‌ব।"

মেয়েটি বিরক্ত হয়ে বল্‌লে, "আমার সময় নেই, আমি চল্‌লুম।"

কিন্তু বেকার লোকের সঙ্গে কাজের লোক পার্‌বে কেন ? রোজ ওদের উৎসতলায় দেখা হয়, আর রোজ সেই একই কথা, "তোমার কাঁখের একটি ঘড়া দাও, তাতে চিত্র কর্‌ব।"

হার মানতে হল, ঘড়া দিলে।

সেইটিকে ঘিরে ঘিরে বেকার আঁক্‌তে লাগ্‌ল, কত রঙের পাক, কত রেখার ঘর।

আঁকা শেষ হলে মেয়েটি ঘড়া তুলে ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখ্‌লে। ভুরু বাঁকিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "এর মানে ?"

বেকার লোকটি বল্‌লে, "এর কোনো মানে নেই।"

ঘড়া নিয়ে মেয়েটি বাড়ি গেল।

সবার চোখের আড়ালে বসে' সেটিকে সে নানা আলোতে নানারকমে হেলিয়ে ঘুরিয়ে দেখ্‌লে। রাত্রে থেকে-থেকে বিছানা ছেড়ে উঠে দীপ জ্বেলে

চুপ করে' বসে' সেই চিত্রটা দেখ্‌তে লাগ্‌ল। তার বয়সে এই সে প্রথম এমন কিছু দেখেচে যার কোনো মানে নেই।

তার পরদিন যখন সে উৎসতলায় এল, তখন তার দুটি পায়ের ব্যস্ততায় একটু যেন বাধা পড়েচে। পা দুটি যেন চল্‌তে চল্‌তে আন্‌-মনা হয়ে ভাব্‌চে—যা ভাব্‌চে তার কোনো মানে নেই।

সেদিনও বেকার মানুষ একপাশে দাঁড়িয়ে।

মেয়েটি বল্‌লে, "কি চাও ?"

সে বল্‌লে, "তোমার হাত থেকে আরো কাজ চাই।"

"কি কাজ দেব ?"

"যদি রাজি হও, রঙীন সুতো বুনে বুনে তোমার বেণী বাঁধ্‌বার দড়ি তৈরি করে' দেব।"

"কি হবে ?"

"কিছুই হবে না।"

নানা-রঙের নানা-কাজ-করা দড়ি তৈরি হল। এখন থেকে আয়না হাতে নিয়ে বেণী বাঁধ্‌তে মেয়ের অনেক সময় লাগে। কাজ পড়ে থাকে, বেলা বয়ে যায়।

৪

এদিকে দেখতে দেখতে কেজো স্বর্গে কাজের

মধ্যে বড় বড় ফাঁক পড়্‌তে লাগ্‌ল। কান্নায় আর গানে সেই ফাঁক ভরে উঠ্‌ল।

স্বর্গীয় প্রবীণেরা বড় চিন্তিত হল। সভা ডাক্‌লে। তারা বল্‌লে, "এখানকার ইতিহাসে কখনো এমন ঘটেনি।"

স্বর্গের দূত এসে অপরাধ স্বীকার কর্‌লে। সে বল্‌লে,"আমি ভুল লোককে ভুল স্বর্গে এনেচি।"

ভুল লোকটিকে সভায় আনা হল। তার রঙীন পাগ্‌ড়ি আর কোমরবন্ধের বাহার দেখেই সবাই বুঝ্‌লে, বিষম ভুল হয়েচে।

সভাপতি তাকে বল্‌লে, "তোমাকে পৃথিবীতে ফিরে যেতে হবে।"

সে তার রঙের ঝুলি আর তুলি কোমরে বেঁধে হাঁফ ছেড়ে বল্‌লে, "তবে চল্‌লুম।"

মেয়েটি এসে বল্‌লে, "আমিও যাব।"

প্রবীণ সভাপতি কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। এই সে প্রথম দেখ্‌লে এমন একটা কাণ্ড যার কোনো মানে নেই।

রাজপুত্তুর

১

রাজপুত্তুর চলেচে, নিজের রাজ্য ছেড়ে, সাতরাজার রাজ্য পেরিয়ে, যে দেশে কোনো রাজার রাজ্য নেই সেই দেশে।

সে হল যে-কালের কথা সে কালের আরম্ভও নেই শেষও নেই।

সহরে গ্রামে আর সকলে হাট বাজার করে, ঘর করে, ঝগড়া করে ; যে আমাদের চিরকালের রাজপুত্তুর সে রাজ্য ছেড়ে ছেড়ে চলে যায়।

কেন যায় ?

কুয়োর জল কুয়োতেই থাকে, খাল বিলের জল খাল বিলের মধ্যেই শান্ত। কিন্তু গিরিশিখরের জল গিরিশিখরে ধরে না, মেঘের জল মেঘের বাঁধন মানে না। রাজপুত্তুরকে তার রাজ্যটুকুর মধ্যে ঠেকিয়ে রাখ্‌বে কে ? তেপান্তর মাঠ দেখে' সে ফেরে না, সাতসমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে যায়।

মানুষ বারেবারে শিশু হয়ে জন্মায় আর বারেবারে নতুন করে এই পুরাতন কাহিনীটি শোনে। সন্ধ্যা-প্রদীপের আলো স্থির হয়ে থাকে, ছেলেরা চুপ করে গালে হাত দিয়ে ভাবে, আমরা সেই রাজপুত্তুর।

তেপান্তর মাঠ যদিবা ফুরোয়, সাম্‌নে সমুদ্র। তারই মাঝখানে দ্বীপ, সেখানে দৈত্যপুরীতে রাজকন্যা বাঁধা আছে।

পৃথিবীতে আর সকলে টাকা খুঁজচে, নাম খুঁজচে, আরাম খুঁজচে; আর যে আমাদের রাজপুত্তুর সে দৈত্যপুরী থেকে রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে বেরিয়েচে। তুফান উঠ্‌ল, নৌকো মিল্‌লনা, তবু সে পথ খুঁজচে।

এইটেই হচ্চে মানুষের সব গোড়াকার রূপকথা, আর সব শেষের। পৃথিবীতে যারা নতুন জন্মেচে, দিদিমার কাছে তাদের এই চিরকালের খবরটি পাওয়া চাই যে, রাজকন্যা বন্দিনী, সমুদ্র দুর্গম, দৈত্য দুর্জ্জয়, আর ছোট মানুষটি একলা দাঁড়িয়ে পণ করচে বন্দিনীকে উদ্ধার করে আনব।

বাইরে বনের অন্ধকারে বৃষ্টি পড়ে, ঝিল্লি ডাকে, আর ছোট ছেলেটি চুপ করে গালে হাত দিয়ে ভাবে, দৈত্যপুরীতে আমাকে পাড়ি দিতে হবে।

২

সাম্‌নে এল অসীম সমুদ্র, স্বপ্নের ঢেউ-তোলা নীল ঘুমের মত। সেখানে রাজপুত্তুর ঘোড়ার উপর থেকে নেমে পড়ল।

কিন্তু যেম্‌নি মাটিতে পা পড়া অম্‌নি এ কি হল? এ কোন্ জাদুকরের জাদু?

এ যে সহর। ট্র্যাম চলেচে। আপিস-মুখো গাড়ির ভিড়ে রাস্তা দুর্গম। তালপাতার বাঁশিওয়ালা গলির ধারে উলঙ্গ ছেলেদের লোভ দেখিয়ে বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে চলেচে।

আর রাজপুত্তুরের এ কি বেশ? এ কি চাল? গায়ে বোতাম-খোলা জামা, ধুতিটা খুব সাফ নয়, জুতোজোড়া জীর্ণ। পাড়াগাঁয়ের ছেলে, সহরে পড়ে, টিউশানি করে' বাসা খরচ চালায়।

রাজকন্যা কোথায়?

তার বাসার পাশের বাড়িতেই।

চাঁপা ফুলের মত রঙ নয়, হাসিতে তার মাণিক খসেনা। আকাশের তারার সঙ্গে তার তুলনা হয় না, তার তুলনা নব বর্ষার ঘাসের আড়ালে যে নামহারা ফুল ফোটে তারি সঙ্গে।

মা-মরা মেয়ে বাপের আদরের ছিল। বাপ ছিল

গরীব, অপাত্রে মেয়ের বিয়ে দিতে চাইল না, মেয়ের বয়স গেল বেড়ে, সকলে নিন্দে করলে।

বাপ গেচে মরে, এখন মেয়ে এসেচে খুড়োর বাড়ীতে।

পাত্রের সন্ধান মিল্‌ল। তার টাকাও বিস্তর, বয়সও বিস্তর, আর নাতি নাৎনীর সংখ্যাও অল্প নয়। তার দাব-রাবের সীমা ছিল না।

খুড়ো বল্‌লেন, মেয়ের কপাল ভাল।

এমন সময় গায়ে-হলুদের দিনে মেয়েটিকে দেখা গেল না, আর পাশের বাসার সেই ছেলেটিকে।

খবর এল তারা লুকিয়ে বিবাহ করেচে। তাদের জাতের মিল ছিল না, ছিল কেবল মনের মিল। সকলেই নিন্দে করলে।

লক্ষপতি তাঁর ইষ্টদেবতার কাছে সোনার সিংহাসন মানৎ করে বল্লেন; "এ ছেলেকে কে বাঁচায়!"

ছেলেটিকে আদালতে দাঁড় করিয়ে বিচক্ষণ সব উকীল প্রবীণ সব সাক্ষী দেবতার কৃপায় দিনকে রাত করে তুল্‌লে। সে বড় আশ্চর্য্য!

সেই দিন ইষ্ট দেবতার কাছে জোড়া পাঁটা কাটা পড়ল, ঢাক ঢোল বাজ্‌ল, সকলেই খুসি হল। বল্‌লে, কলিকাল বটে, কিন্তু ধর্ম্ম এখনো জেগে আছেন।

৩

তার পরে অনেক কথা। জেল থেকে ছেলেটি ফিরে এল। কিন্তু দীর্ঘপথ আর শেষ হয় না। তেপান্তর মাঠের চেয়েও সে দীর্ঘ এবং সঙ্গিহীন। কতবার অন্ধকারে তাকে শুন্‌তে হল, হাঁউমাউ খাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ। মানুষকে খাবার জন্যে চারিদিকে এত লোভ।

রাস্তার শেষ নেই কিন্তু চলার শেষ আছে। একদিন সেই শমে এসে সে থাম্‌ল।

সেদিন তাকে দেখবার লোক কেউ ছিল না। শিয়রে কেবল একজন দয়াময় দেবতা জেগে ছিলেন। তিনি যম।

সেই যমের সোনার কাঠি যেম্‌নি ছোঁয়ানো অম্‌নি এ কি কাণ্ড! সহর গেল মিলিয়ে, স্বপন গেল ভেঙে।

মুহূর্ত্তে আবার দেখা দিল সেই রাজপুত্তুর। তার কপালে অসীমকালের রাজটীকা। দৈত্যপুরীর দ্বার সে ভাঙবে, রাজকন্যার শিকল সে খুল্‌বে।

যুগে যুগে শিশুরা মায়ের কোলে বসে খবর পায়,— সেই ঘরছাড়া মানুষ তেপান্তর মাঠ দিয়ে কোথায় চল্‌ল। তার সাম্‌নের দিকে সাত সমুদ্রের ঢেউ গর্জ্জন করচে।

ইতিহাসের মধ্যে তার বিচিত্র চেহারা; ইতিহাসের পরপারে তার একই রূপ,—সে রাজপুত্তুর।

সুয়োরাণীর সাধ

সুয়োরাণীর বুঝি মরণকাল এল।

তার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠ্‌চে, তার কিছুই ভাল লাগ্‌চে না। বদ্দি বড়ি নিয়ে এল। মধু দিয়ে মেড়ে বল্‌লে, "খাও।" সে ঠেলে ফেলে দিলে।

রাজার কানে খবর গেল। রাজা তাড়াতাড়ি সভা ছেড়ে এল। পাশে বসে জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার কি হয়েছে, কি চাই?"

সে গুম্‌রে উঠে বল্‌লে, "তোমরা সবাই যাও; একবার আমার স্যাঙাৎনীকে ডেকে দাও।"

স্যাঙাৎনী এল। রাণী তার হাত ধরে বল্‌লে, "সই, বস। কথা আছে।"

স্যাঙাৎনী বল্‌লে, "প্রকাশ করে বল।"

সুয়োরাণী বল্‌লে, "আমার সাতমহলা বাড়ির একধারে তিনটে মহল ছিল দুয়োরাণীর। তারপরে হল দুটো, তারপরে হল একটা। তারপরে রাজবাড়ী থেকে সে বের হয়ে গেল।

তারপরে দুয়োরাণীর কথা আমার মনেই রইল না।

তারপরে একদিন দোলযাত্রা। নাটমন্দিরে যাচ্চি ময়ূরপংখী চড়ে। আগে লোক, পিছে লস্কর। ডাইনে বাজে বাঁশি, বাঁয়ে বাজে মৃদঙ্গ।

এমন সময় পথের পাশে নদীর ধারে ঘাটের উপরটিতে দেখি একখানি কুঁড়ে ঘর, চাঁপা গাছের ছায়ায়। বেড়া বেয়ে অপরাজিতার ফুল ফুটেচে, দুয়োরের সাম্‌নে চালের গুঁড়ো দিয়ে শঙ্খচক্রের আলপনা। আমার ছত্রধারিণীকে শুধোলেম, "আহা ঘরখানি কার?" সে বল্‌লে দুয়োরাণীর।

তারপরে ঘরে ফিরে এসে সন্ধ্যের সময় বসে আছি, ঘরে প্রদীপ জ্বালিনি, মুখে কথা নেই।

রাজা এসে বল্‌লে, "তোমার কি হয়েচে, কি চাই?"

আমি বল্‌লেম্, "এ ঘরে আমি থাক্‌ব না।"

রাজা বল্‌লে, "আমি তোমার কোঠাবাড়ি বানিয়ে দেব গজদন্তের দেওয়াল দিয়ে। শঙ্খের গুঁড়োয় মেঝেটি হবে দুধের ফেনার মত শাদা, মুক্তোর ঝিনুক দিয়ে তার কিনারে এঁকে দেব পদ্মের মালা।"

আমি বল্‌লেম, "আমার বড় সাধ গিয়েচে কুঁড়ে ঘর বানিয়ে থাকি তোমার বাহির বাগানের একটি ধারে।"

রাজা বল্‌লে, "আচ্ছা বেশ, তার আর ভাবনা কি?"

কুঁড়ে ঘর বানিয়ে দিলে। সে ঘর যেন তুলে-আনা বনফুল। যেম্‌নি তৈরি হল অম্‌নি যেন মুষড়ে গেল। বাস করতে গেলেম, কেবল লজ্জা পেলেম।

তারপরে একদিন স্নানযাত্রা।

নদীতে নাইতে গেছি। সঙ্গে একশো সাতজন সঙ্গিনী। জলের মধ্যে পাল্‌কী নামিয়ে দিলে, স্নান হল।

পথে ফিরে আস্‌চি, পাল্‌কীর দরজা একটু ফাঁক করে দেখি, ও কোন্‌ ঘরের বউ গা! যেন নির্ম্মাল্যের ফুল। হাতে শাদা শাঁখা, পরণে লালপেড়ে সাড়ি। স্নানের পর ঘড়ায় করে জল তুলে আন্‌চে, সকালের আলো তার ভিজে চুলে আর ভিজে ঘড়ার উপর ঝিকিয়ে উঠ্‌চে।

ছত্রধারিণীকে শুধোলেম, "মেয়েটি কে, কোন্‌ দেবমন্দিরে তপস্যা করে?"

ছত্রধারিণী হেসে বল্‌লে, "চিন্‌তে পারলে না, ঐ ত দুয়োরাণী।"

তারপরে ঘরে ফিরে একলা বসে আছি, মুখে কথা নেই। রাজা এসে বল্‌লে, "তোমার কি হয়েচে, কি চাই?"

আমি বল্‌লেম্‌, "আমার বড় সাধ, রোজ সকালে

নদীতে নেয়ে মাটির ঘড়ায় জল তুলে আন্‌ব বকুলতলার রাস্তা দিয়ে।”

রাজা বল্‌লে, “আচ্ছা বেশ, তার আর ভাবনা কি?”

রাস্তায় রাস্তায় পাহারা বস্‌ল, লোকজন গেল সরে।

সাদা শাঁখা পরলেম, আর লালপেড়ে সাড়ি। নদীতে স্নান সেরে ঘড়ায় করে জল তুলে আন্‌লেম। দুয়োরের কাছে এসে মনের দুঃখে ঘড়া আছড়ে ভাঙলেম। যা ভেবেছিলেম তা হল না, শুধু লজ্জা পেলেম।

তারপরে সেদিন রাসযাত্রা।

মধুবনে জ্যোৎস্নারাতে তাঁবু পড়ল। সমস্ত রাত নাচ হল গান হল।

পরদিন সকালে হাতির উপর হাওদা চড়ল। পরদার আড়ালে বসে ঘরে ফিরচি, এমন সময় দেখি বনের পথ দিয়ে কে চলেচে, তার নবীন বয়েস। চূড়ায় তার বনফুলের মালা। হাতে তার ডালি, তাতে শালুক ফুল, তাতে বনের ফল, তাতে ক্ষেতের শাক।

ছত্রধারিণীকে শুধোলেম, “কোন্‌ ভাগ্যবতীর ছেলে পথ আলো করেচে?

ছত্রধারিণী বল্‌লে, “জান না? ঐ ত দুয়োরাণীর ছেলে। ওর মা’র জন্যে নিয়ে চলেচে, শালুক ফুল, বনের ফল, ক্ষেতের শাক।”

তারপরে ঘরে ফিরে একলা বসে আছি, মুখে কথা নেই।

রাজা এসে বল্‌লে, “তোমার কি হয়েচে, কি চাই ?”

আমি বল্‌লেম, “আমার বড় সাধ রোজ খাব শালুক ফুল, বনের ফল, ক্ষেতের শাক, আমার ছেলে নিজের হাতে তুলে আন্‌বে।”

রাজা বল্‌লে, “আচ্ছা বেশ, তার আর ভাবনা কি ?”

সোনার পালঙ্কে বসে আছি, ছেলে ডালি নিয়ে এল। তার সর্ব্বাঙ্গে ঘাম, তার মুখে রাগ। ডালি পড়ে রইল, লজ্জা পেলেম।

তারপরে আমার কি হল কি জানি।

একলা বসে থাকি, মুখে কথা নেই। রাজা রোজ এসে আমাকে শুধোয়, “তোমার কি হয়েচে, কি চাই ?”

সুয়োরাণী হয়েও কি চাই সে কথা লজ্জায় কাউকে বল্‌তে পারিনে। তাই তোমাকে ডেকেচি স্যাঙাৎনি। আমার শেষ কথাটি বলি তোমার কানে, “ঐ দুয়োরাণীর দুঃখ আমি চাই।”

স্যাঙাৎনী গালে হাত দিয়ে বল্‌লে, “কেন বল ত ?”

সুয়োরাণী বল্‌লে, “ওর ঐ বাঁশের বাঁশীতে সুর বাজ্‌ল, কিন্তু আমার সোনার বাঁশী কেবল বয়েই বেড়ালেম, আগ্‌লে বেড়ালেম, বাজাতে পারলেম না।”

বিদূষক

১

কাঞ্চীর রাজা কর্ণাট জয় করতে গেলেন। তিনি হলেন জয়ী। চন্দনে, হাতির দাঁতে, আর সোনা-মাণিকে হাতি বোঝাই হল।

দেশে ফেরবার পথে বলেশ্বরীর মন্দির বলির রক্তে ভাসিয়ে দিয়ে রাজা পূজো দিলেন।

পূজো দিয়ে চলে আস্‌চেন—গায়ে রক্তবস্ত্র, গলায় জবার মালা, কপালে রক্তচন্দনের তিলক—সঙ্গে কেবল মন্ত্রী আর বিদূষক।

একজায়গায় দেখ্‌লেন পথের ধারে আমবাগানে ছেলেরা খেলা করচে।

রাজা তাঁর দুই সঙ্গীকে বল্‌লেন, "দেখে আসি, ওরা কি খেল্‌চে।"

২

ছেলেরা দুই সারি পুতুল সাজিয়ে যুদ্ধ-যুদ্ধ খেল্‌চে।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "কার সঙ্গে কার যুদ্ধ ?"

তারা বল্‌লে, "কর্ণাটের সঙ্গে কাঞ্চীর।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "কার জিৎ, কার হার ?

ছেলেরা বুক ফুলিয়ে বল্‌লে, "কর্ণাটের জিৎ কাঞ্চীর হার।"

মন্ত্রীর মুখ গম্ভীর হল, রাজার চক্ষু রক্তবর্ণ, বিদূষক হা হা করে হেসে উঠ্‌ল।

৩

রাজা যখন তাঁর সৈন্য নিয়ে ফিরে এলেন, তখনো ছেলেরা খেল্‌চে।

রাজা হুকুম করলেন, "একেকটা ছেলেকে গাছের সঙ্গে বাঁধো, আর লাগাও বেত !"

গ্রাম থেকে তাদের মা-বাপ ছুটে এল। বল্‌লে, "ওরা অবোধ, ওরা খেলা কর্‌ছিল, ওদের মাপ কর।"

রাজা সেনাপতিকে ডেকে বল্‌লেন, "এই গ্রামকে শিক্ষা দেবে, কাঞ্চীর রাজাকে কোনো দিন যেন ভুল্‌তে না পারে।"

এই বলে শিবিরে চলে গেলেন।

৪

সন্ধ্যে বেলায় সেনাপতি রাজার সমুখে এসে দাঁড়াল। প্রণাম করে বল্‌লে, "মহারাজ, শৃগাল কুকুর ছাড়া এ গ্রামে কারো মুখে শব্দ শুন্‌তে পাবে না।"

মন্ত্রী বল্‌লে, "মহারাজের মান রক্ষা হল।"

পুরোহিত বল্‌লে, "বিশ্বেশ্বরী মহারাজের সহায়।"

বিদূষক বল্‌লে, "মহারাজ, এবার আমাকে বিদায় দিন্‌।"

রাজা বল্‌লেন, "কেন?"

বিদূষক বল্‌লে, "আমি মার্‌তেও পারিনে, কাট্‌তেও পারিনে, বিধাতার প্রসাদে আমি কেবল হাস্‌তে পারি। মহারাজের সভায় থাক্‌লে আমি হাস্‌তে ভুলে যাব।"

ঘোড়া

সৃষ্টির কাজ প্রায় শেষ হয়ে যখন ছুটির ঘণ্টা বাজে বলে', হেনকালে ব্রহ্মার মাথায় একটা ভাবোদয় হল।

ভাণ্ডারীকে ডেকে বল্‌লেন, "ওহে ভাণ্ডারী, আমার কারখানা ঘরে কিছু কিছু পঞ্চভূতের জোগাড় করে আন, আর একটা নতুন প্রাণী সৃষ্টি করব।"

ভাণ্ডারী হাত জোড় করে বল্‌লে, "পিতামহ, আপনি যখন উৎসাহ করে' হাতি গড়লেন, তিমি গড়লেন, অজগর সর্প গড়লেন, সিংহ ব্যাঘ্র গড়লেন, তখন হিসাবের দিকে আদৌ খেয়াল করলেন না। যতগুলো ভারী আর কড়া জাতের ভূত ছিল সব প্রায় নিকাশ হয়ে এল। ক্ষিতি অপ্‌ তেজ তলায় এসে ঠেকেচে। থাক্‌বার মধ্যে আছে মরুৎ-ব্যোম, তা' সে যত চাই।"

চতুর্ম্মুখ কিছুক্ষণ ধরে চার জোড়া গোঁফে তা' দিয়ে বল্‌লেন, "আচ্ছা ভাল, ভাণ্ডারে যা আছে তাই নিয়ে এস, দেখা যাক্‌!"

এবারে প্রাণীটিকে গড়বার বেলা ব্রহ্মা ক্ষিতি অপ্‌ তেজটাকে খুব হাতে রেখে খরচ করলেন। তাকে না দিলেন শিং, না দিলেন নখ, আর দাঁত যা দিলেন, তা'তে চিবনো চলে, কামড়ানো চলে না। তেজের ভাণ্ড থেকে কিছু খরচ করলেন বটে, তাতে প্রাণীটা যুদ্ধক্ষেত্রের কোনো কোনো কাজে লাগ্‌বার মত হল, কিন্তু তার লড়াইয়ের সখ রইল না। এই প্রাণীটি হচ্চে ঘোড়া। এ ডিম পাড়ে না তবু বাজারে তার ডিম নিয়ে একটা গুজব আছে, তাই এ'কে দ্বিজ বলা চলে।

আর যাই হোক্‌, সৃষ্টিকর্ত্তা এর গড়নের মধ্যে মরুৎ আর ব্যোম একেবারে ঠেসে দিলেন। ফল হল এই যে, এর মনটা প্রায় ষোলো আনা গেল মুক্তির দিকে। এ হাওয়ার আগে ছুটতে চায়, অসীম আকাশকে পেরিয়ে যাবে বলে পণ করে বসে। অন্য সকল প্রাণী, কারণ উপস্থিত হলে, দৌড়য়; এ দৌড়য় বিনা কারণে; যেন তার নিজেই নিজের কাছ থেকে পালিয়ে যাবার একান্ত সখ। কিছু কাড়তে চায় না, কাউকে মারতে চায় না, কেবলি পালাতে চায়। পালাতে পালাতে একেবারে বুঁদ হয়ে যাবে, ঝিম্‌ হয়ে যাবে, ভোঁ হয়ে যাবে, তার পরে না হয়ে যাবে, এই তার মৎলব। জ্ঞানীরা বলেন, ধাতের মধ্যে মরুৎব্যোম যখন ক্ষিতি

অপ্ তেজকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে ওঠে তখন এই রকমই ঘটে।

ব্রহ্মা বড় খুসি হলেন। বাসার জন্যে তিনি অন্য জন্তুর কাউকে দিলেন বন, কাউকে দিলেন গুহা, কিন্তু এর দৌড় দেখ্‌তে ভালবাসেন বলে এ'কে দিলেন খোলা মাঠ।

মাঠের ধারে থাকে মানুষ। কাড়াকুড়ি করে সে যা-কিছু জমায় সমস্তই মস্ত বোঝা হয়ে ওঠে। তাই যখন মাঠের মধ্যে ঘোড়াটাকে ছুটতে দেখে, মনে মনে ভাবে এটাকে কোন গতিকে বাঁধতে পারলে আমাদের হাট করার বড় সুবিধে!

ফাঁস লাগিয়ে ধরলে একদিন ঘোড়াটাকে। তার পিঠে দিলে জিন, মুখে দিলে কাঁটা লাগাম। ঘাড়ে তার লাগায় চাবুক আর কাঁধে মারে জুতোর শেল। তা ছাড়া আছে দলামলা।

মাঠে ছেড়ে রাখ্‌লে হাতছাড়া হবে তাই ঘোড়াটার চারিদিকে পাঁচিল তুলে দিলে। বাঘের ছিল বন, তার বনই রইল; সিংহের ছিল গুহা কেউ কাড়ল না। কিন্তু ঘোড়ার ছিল খোলামাঠ, সে এসে ঠেকল আস্তাবলে। প্রাণীটাকে মরুৎব্যোম মুক্তির দিকে অত্যন্ত উস্কে দিলে কিন্তু বন্ধন থেকে বাঁচাতে পারলে না।

যখন অসহ্য হল তখন ঘোড়া তার দেয়ালটার পরে লাথি চালাতে লাগ্‌ল। তার পা যতটা জখম হল দেয়াল ততটা হল না; তবু চুন বালি খসে' দেয়ালের সৌন্দর্য্য নষ্ট হতে লাগ্‌ল।

এতে মানুষের মনে বড় রাগ হল। বল্‌লে, "একেই বলে অকৃতজ্ঞতা। দানাপানি খাওয়াই, মোটা মাইনের সইস আনিয়ে আটপ্রহর ওর পিছনে খাড়া রাখি, তবু মন পাই নে!"

মন পাবার জন্যে সইসগুলো এমনি উঠেপড়ে ডাণ্ডা চালালে যে ওর আর লাথি চল্‌ল না। মানুষ তার পাড়াপড়শিকে ডেকে বল্‌লে, "আমার এই বাহনটির মত এমন ভক্ত বাহন আর নেই।"

তারা তারিফ করে বল্‌লে, "তাইত একেবারে জলের মত ঠাণ্ডা! তোমারই ধর্ম্মের মত ঠাণ্ডা!"

একে ত গোড়া থেকেই ওর উপযুক্ত দাঁত নেই, নখ নেই, শিঙ নেই, তার পরে দেয়ালে এবং তদভাবে শূন্যে লাথি ছোঁড়াও বন্ধ। তাই মনটাকে খোলসা করবার জন্যে আকাশে মাথা তুলে সে চিঁহি চিঁহি করতে লাগ্‌ল। তাতে মানুষের ঘুম ভেঙে যায় আর পাড়াপড়শিরাও ভাবে আওয়াজটা ত ঠিক ভক্তি-গদ্‌গদ শোনাচ্চে না। মুখ বন্ধ করবার অনেক রকম যন্ত্র বেরল। কিন্তু দম বন্ধ না করলে মুখ ত একেবারে বন্ধ

হয় না। তাই চাপা আওয়াজ মুমূর্ষুর খাবির মত মাঝে মাঝে বেরতে থাকে।

একদিন সেই আওয়াজ গেল ব্রহ্মার কানে। তিনি ধ্যান ভেঙে একবার পৃথিবীর খোলা মাঠের দিকে তাকালেন। সেখানে ঘোড়ার চিহ্ন নেই।

পিতামহ যমকে ডেকে বল্‌লেন, "নিশ্চয় তোমারি কীর্ত্তি! আমার ঘোড়াটিকে নিয়েচ!"

যম বল্‌লেন "সৃষ্টিকর্ত্তা, আমাকেই তোমার যত সন্দেহ! একবার মানুষের পাড়ার দিকে তাকিয়ে দেখ!"

ব্রহ্মা দেখেন, অতি ছোট জায়গা, চারদিকে পাঁচিল তোলা; তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ক্ষীণস্বরে ঘোড়াটি চিঁহি চিঁহি করচে।

হৃদয় তাঁর বিচলিত হল। মানুষকে বল্‌লেন, "আমার এই জীবকে যদি মুক্তি না দাও তবে বাঘের মত ওর নখ দন্ত বানিয়ে দেব, ও তোমার কোনো কাজে লাগ্‌বে না!"

মানুষ বল্‌লে, "ছিছি তাতে হিংস্রতার বড় প্রশ্রয় দেওয়া হবে। কিন্তু যাই বল, পিতামহ, তোমার এই প্রাণীটি মুক্তির যোগ্যই নয়। ওর হিতের জন্যেই অনেক খরচে আস্তাবল বানিয়েচি। খাসা আস্তাবল!"

ব্রহ্মা জেদ করে বল্‌লেন "ওকে ছেড়ে দিতেই হবে।"

মানুষ বল্‌লে, আচ্ছা ছেড়ে দেব। কিন্তু সাত দিনের মেয়াদে, তার পরে যদি বল তোমার মাঠের চেয়ে আমার আস্তাবল ওর পক্ষে ভাল নয় তাহলে নাকে খৎ দিতে রাজি আছি।"

মানুষ করলে কি, ঘোড়াটাকে মাঠে দিলে ছেড়ে; কিন্তু তার সামনের দুটো পায়ে কসে রসি বাঁধ্‌ল। তখন ঘোড়া এমনি চল্‌তে লাগ্‌ল যে ব্যাঙের চাল তার চেয়ে সুন্দর।

ব্রহ্মা থাকেন সুদূর স্বর্গে; তিনি ঘোড়াটার চাল দেখ্‌তে পান, তার হাঁটুর বাধন দেখ্‌তে পান না। তিনি নিজের কীর্ত্তির এই ভাঁড়ের মত চালচলন দেখে লজ্জায় লাল হয়ে উঠ্‌লেন। বল্‌লেন "ভুল করেচি ত!"

মানুষ হাত জোড় করে বল্‌লে, "এখন এটাকে নিয়ে করি কি? আপনার ব্রহ্মলোকে যদি মাঠ থাকে ত বরঞ্চ সেইখানে রওনা করে দিই।"

ব্রহ্মা ব্যাকুল হয়ে বল্‌লেন, "যাও, যাও, ফিরে নিয়ে যাও তোমার আস্তাবলে!"

মানুষ বল্‌লে, "আদিদেব, মানুষের পক্ষে এ যে এক বিষম বোঝা!"

ব্রহ্মা বল্‌লেন, "সেই ত মানুষের মনুষ্যত্ব!

কর্ত্তার ভূত

১

বুড়ো কর্ত্তার মরণকালে দেশসুদ্ধ সবাই বলে উঠ্‌ল, "তুমি গেলে আমাদের কি দশা হবে ?"

শুনে তারও মনে দুঃখ হল। ভাব্‌লে, "আমি গেলে এদের ঠাণ্ডা রাখ্‌বে কে ?"

তা' বলে' মরণ ত এড়াবার জো নেই। তবু দেবতা দয়া করে বল্‌লেন, "ভাবনা কি ? লোকটা ভূত হয়েই এদের ঘাড়ে চেপে থাক্‌ না। মানুষের মৃত্যু আছে, ভূতের ত মৃত্যু নেই।"

২

দেশের লোক ভারি নিশ্চিন্ত হল।

কেননা, ভবিষ্যৎকে মান্‌লেই তার জন্যে যত ভাবনা, ভূতকে মান্‌লে কোনো ভাবনাই নেই; সকল ভাবনা ভূতের মাথায় চাপে। অথচ তার মাথা নেই, সুতরাং কারো জন্যে মাথাব্যথাও নেই।

তবু স্বভাব-দোষে যারা নিজের ভাবনা নিজে ভাব্‌তে যায় তারা খায় ভূতের কানমলা। সেই কানমলা না যায় ছাড়ানো, তার থেকে না যায় পালানো, তার বিরুদ্ধে না চলে নালিশ, তার সম্বন্ধে না আছে বিচার।

দেশসুদ্ধ লোক ভূতগ্রস্ত হয়ে চোখ বুজে চলে। দেশের তত্ত্বজ্ঞানীরা বলেন, "এই চোখ বুজে চলাই হচ্চে জগতের সবচেয়ে আদিম চলা। এ'কেই বলে অদৃষ্টের চালে চলা। সৃষ্টির প্রথম চক্ষুহীন কীটাণুরা এই চলা চল্‌ত; ঘাসের মধ্যে গাছের মধ্যে আজও এই চলার আভাস প্রচলিত।"

শুনে ভূতগ্রস্ত দেশ আপন আদিম আভিজাত্য অনুভব করে। তাতে অত্যন্ত আনন্দ পায়।

ভূতের নায়েব ভূতুড়ে জেলখানার দারোগা। সেই জেলখানার দেয়াল চোখে দেখা যায় না। এই জন্যে ভেবে পাওয়া যায় না সেটাকে ফুটো করে কি উপায়ে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব।

এই জেলখানায় যে-ঘানি নিরন্তর ঘোরাতে হয় তার থেকে একছটাক তেল বেরোয় না যা হাটে বিকোতে পারে,—বেরোবার মধ্যে বেরিয়ে যায় মানুষের তেজ। সেই তেজ বেরিয়ে গেলে মানুষ ঠাণ্ডা হয়ে যায়। তা'তে করে' ভূতের রাজত্বে আর

কিচ্ছুই না থাক্,—অন্ন হোক্, বস্ত্র হোক্, স্বাস্থ্য হোক্,—শান্তি থাকে।

কত যে শান্তি তার একটা দৃষ্টান্ত এই যে, অন্য সব দেশে ভূতের বাড়াবাড়ি হলেই মানুষ অস্থির হয়ে ওঝার খোঁজ করে। এখানে সে চিন্তাই নেই। কেননা ওঝাকেই আগেভাগে ভূতে পেয়ে বসেচে।

৩

এই ভাবেই দিন চল্‌ত, ভূতশাসনতন্ত্র নিয়ে কারো মনে দ্বিধা জাগ্‌ত না; চিরকালই গর্ব্ব কর্‌তে পার্‌ত যে এদের ভবিষ্যৎটা পোষা ভ্যাড়ার মত ভূতের খোঁটায় বাঁধা, সে ভবিষ্যৎ ভ্যা-ও করে না, ম্যা-ও করে না, চুপ করে পড়ে থাকে মাটিতে; যেন একেবারে চিরকালের মত মাটি!

কেবল অতি সামান্য একটা কারণে একটু মুস্কিল বাধ্‌ল। সেটা হচ্চে এই যে, পৃথিবীর অন্য দেশগুলোকে ভূতে পায় নি। তাই অন্য সব দেশে যত ঘানি ঘোরে তার থেকে তেল বেরোয় তাদের ভবিষ্যতের রথচক্রটাকে সচল করে রাখ্‌বার জন্যে, বুকের রক্ত পিষে ভূতের খর্পরে ঢেলে দেবার জন্যে নয়। কাজেই মানুষ সেখানে একেবারে জুড়িয়ে যায় নি। তারা ভয়ঙ্কর সজাগ আছে।

৪

এদিকে দিব্যি ঠাণ্ডায় ভূতের রাজ্য জুড়ে "খোকা ঘুমোলো, পাড়া জুড়োলো।"

সেটা খোকার পক্ষে আরামের, খোকার অভিভাবকের পক্ষেও; আর পাড়ার কথা ত বলাই আছে।

কিন্তু "বর্গি এল দেশে।"

নইলে ছন্দ মেলে না, ইতিহাসের পদটা খোঁড়া হয়েই থাকে। দেশে যত শিরোমণি চূড়ামণি আছে সবাইকে জিজ্ঞাসা করা গেল "এমন হল কেন?"

তারা একবাক্যে শিখা নেড়ে বল্‌লে, "এটা ভূতের দোষ নয়, ভূতুড়ে দেশের দোষ নয়, একমাত্র বর্গিরই দোষ। বর্গি আসে কেন?"

শুনে সকলেই বল্‌লে, "তা ত বটেই!" অত্যন্ত সান্ত্বনা বোধ কর্‌লে।

দোষ যারই থাক্, খিড়্‌কির আনাচে-কানাচে ঘোরে ভূতের পেয়াদা, আর সদরের রাস্তায়-ঘাটে ঘোরে অভূতের পেয়াদা; ঘরে গেরস্তর টেঁকা দায়, ঘর থেকে বেরোবারও পথ নেই। একদিক থেকে এ হাঁকে, "খাজ্‌না দাও!" আরেক দিক থেকে ও হাঁকে "খাজনা দাও।"

এখন কথাটা দাঁড়িয়েছে, "খাজনা দেব কিসে ?"

এতকাল উত্তর দক্ষিণ পূব পশ্চিম থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে নানা জাতের বুল্‌বুলি এসে বেবাক ধান খেয়ে গেল, কারো হুঁস ছিল না। জগতে যারা হুঁসিয়ার এরা তাদের কাছে ঘেঁষ্‌তে চায় না, পাছে প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হয়। কিন্তু তারা অকস্মাৎ এদের অত্যন্ত কাছে ঘেঁষে, এবং প্রায়শ্চিত্তও করে না। শিরোমণি চূড়ামণির দল পুঁথি খুলে বল্লেন, "বেহুঁস্ যারা তারাই পবিত্র, হুঁসিয়ার যারা তারাই অশুচি, অতএব হুঁসিয়ারদের প্রতি উদাসীন থেকো, প্রবুদ্ধমিব সুপ্তঃ।"

শুনে সকলের অত্যন্ত আনন্দ হয়।

৫

কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ প্রশ্নকে ঠেকানো যায় না; "খাজ্‌না দেব কিসে ?"

শ্মশান থেকে মশান থেকে ঝোড়ো হাওয়ায় হাহা করে' তার উত্তর আসে, "আব্রু দিয়ে, ইজ্জৎ দিয়ে, ইমান্ দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে।"

প্রশ্নমাত্রেরই দোষ এই যে, যখন আসে একা আসে না। তাই আরো একটা প্রশ্ন উঠে পড়েছে; "ভূতের শাসনটাই কি অনন্তকাল চল্‌বে ?"

শুনে ঘুম-পাড়ানী মাসি পিসি আর মাসতুত

পিস্‌তুতোর দল কানে হাত দিয়ে বলে, "কি সর্ব্বনাশ! এমন প্রশ্ন ত বাপের জন্মে শুনি নি। তা হলে সনাতন ঘুমের কি হবে, সেই আদিমতম, সকল জাগরণের চেয়ে প্রাচীনতম ঘুমের ?"

প্রশ্নকারী বলে, "সে ত বুঝ্‌লুম, কিন্তু আধুনিকতম বুল্‌বুলির ঝাঁক, আর উপস্থিততম বর্গির দল, এদের কি করা যায় ?"

মাসি পিসি বলে, "বুল্‌বুলির ঝাঁককে কৃষ্ণনাম শোনাব, আর বর্গির দলকেও।"

অর্ব্বাচীনেরা উদ্ধত হয়ে বলে ওঠে, "যেমন করে পারি ভূত ছাড়াব।"

ভূতের নায়েব চোখ পাকিয়ে বলে, "চুপ! এখনো ঘানি অচল হয় নি।"

শুনে দেশের খোকা নিস্তব্ধ হয়, তারপরে পাশ ফিরে শোয়।

৬

মোদ্দা কথাটা হচ্চে বুড়ো কর্ত্তা বেঁচেও নেই, মরেও নেই, ভূত হয়ে আছে। দেশটাকে সে নাড়েও না অথচ ছাড়েও না।

দেশের মধ্যে দুটো একটা মানুষ—যারা দিনের বেলা নায়েবের ভয়ে কথা কয় না,—তারা গভীর রাত্রে

হাত জোড় করে বলে "কর্ত্তা, এখনো কি ছাড়্‌বার সময় হয় নি?"

কর্ত্তা বলেন, "ওরে অবোধ, আমার ধরাও নেই ছাড়াও নেই, তোরা ছাড়্‌লেই আমার ছাড়া।"

তারা বলে, "ভয় করে যে কর্ত্তা!"

কর্ত্তা বলেন, "সেইখানেই ত ভূত।"

১

এক যে ছিল পাখী। সে ছিল মূর্খ। সে গান গাহিত, শাস্ত্র পড়িত না। লাফাইত, উড়িত; জানিত না কায়দা কানুন কাকে বলে।

রাজা বলিলেন, "এমন পাখী ত কাজে লাগে না, অথচ বনের ফল খাইয়া রাজহাটে ফলের বাজারে লোকসান ঘটায়।"

মন্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "পাখীটাকে শিক্ষা দাও!"

রাজার ভাগিনাদের উপর ভার পড়িল পাখীটাকে শিক্ষা দিবার।

পণ্ডিতেরা বসিয়া অনেক বিচার করিলেন। প্রশ্নটা এই, "উক্ত জীবের অবিদ্যার কারণ কি?"

সিদ্ধান্ত হইল, সামান্য খড়কুটা দিয়া পাখী যে-বাসা বাঁধে, সে-বাসায় বিদ্যা বেশি ধরে না। তাই সকলের আগে দরকার ভালো করিয়া খাঁচা বানাইয়া দেওয়া।

রাজ-পণ্ডিতেরা দক্ষিণা পাইয়া খুসী হইয়া বাসায় ফিরিলেন।

৩

স্যাকরা বসিল সোনার খাঁচা বানাইতে। খাঁচাটা হইল এমন আশ্চর্য্য যে, দেখিবার জন্য দেশ-বিদেশের লোক ঝুঁকিয়া পড়িল। কেহ বলে, "শিক্ষার একেবারে হদ্দমুদ্দ!" কেহ বলে, "শিক্ষা যদি নাও হয়, খাঁচা ত হইল। পাখীর কি কপাল!"

স্যাকরা থলি বোঝাই করিয়া বক্‌শিস্ পাইল। খুসি হইয়া সে তখনি পাড়ি দিল বাড়ির দিকে।

পণ্ডিত বসিলেন পাখীকে বিদ্যা শিখাইতে। নস্য লইয়া বলিলেন "অল্প পুঁথির কর্ম্ম নয়।"

ভাগিনা তখন পুঁথি-লিখকদের তলব করিলেন। তারা পুঁথির নকল করিয়া এবং নকলের নকল করিয়া পর্ব্বতপ্রমাণ করিয়া তুলিল। যে দেখিল সেই বলিল, "সাবাস! বিদ্যা আর ধরে না!"

লিপিকরের দল পারিতোষিক লইল বলদ

বোঝাই করিয়া। তখনি ঘরের দিকে দৌড় দিল। তাদের সংসারে আর টানাটানি রহিল না।

অনেক দামের খাঁচাটার জন্য ভাগিনাদের খবরদারির সীমা নাই। মেরামত ত লাগিয়াই আছে। তারপরে ঝাড়া মোছা পালিস করার ঘটা দেখিয়া সকলেই বলিল, "উন্নতি হইতেছে!" লোক লাগিল বিস্তর এবং তাদের উপর নজর রাখিবার জন্য লোক লাগিল আরো বিস্তর। তারা মাস-মাস মুঠা-মুঠা তন্‌খা পাইয়া সিন্ধুক বোঝাই করিল।

তারা এবং তাদের মামাতো খুড়তুতো মাস্‌তুতো ভাইরা খুসি হইয়া কোঠা বালাখানায় গদি পাতিয়া বসিল।

৪

সংসারে অন্য অভাব অনেক আছে, কেবল নিন্দুক আছে যথেষ্ট। তারা বলিল, "খাঁচাটার উন্নতি হইতেছে কিন্তু পাখীটার খবর কেহ রাখে না।"

কথাটা রাজার কানে গেল। তিনি ভাগিনাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভাগিনা, এ কি কথা শুনি?"

ভাগিনা বলিল, "মহারাজ, সত্য কথা যদি শুনিবেন তবে ডাকুন স্যাকরাদের, পণ্ডিতদের,

লিপিকরদের, ডাকুন যারা মেরামত করে এবং মেরামত তদারক করিয়া বেড়ায়। নিন্দুকগুলো খাইতে পায় না বলিয়াই মন্দ কথা বলে।"

জবাব শুনিয়া রাজা অবস্থাটা পরিষ্কার বুঝিলেন আর তখনি ভাগিনার গলায় সোনার হার চড়িল।

৫

শিক্ষা যে কি ভয়ঙ্কর তেজে চলিতেছে রাজার ইচ্ছা হইল স্বয়ং দেখিবেন। একদিন তাই পাত্র মিত্র অমাত্য লইয়া শিক্ষাশালায় তিনি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত।

দেউড়ির কাছে অমনি বাজিল শাঁখ ঘণ্টা ঢাক ঢোল কাড়া নাকাড়া তুরী ভেরি দামামা কাঁশি বাঁশি কাঁসর খোল করতাল মৃদঙ্গ জগঝম্প। পণ্ডিতেরা গলা ছাড়িয়া টিকি নাড়িয়া মন্ত্রপাঠে লাগিলেন। মিস্ত্রি মজুর স্যাকরা লিপিকর তদারকনবিশ আর মামাতো পিস্‌তুতো খুড়তুতো এবং মাস্‌তুতো ভাই জয়ধ্বনি তুলিল।

ভাগিনা বলিল, "মহারাজ, কাণ্ডটা দেখিতেছেন!"

মহারাজ বলিলেন, "আশ্চর্য্য! শব্দ কম নয়।"

ভাগিনা বলিল, "শুধু শব্দ নয় পিছনে অর্থও কম নাই।"

রাজা খুসি হইয়া দেউড়ি পার হইয়া যেই হাতিতে উঠিবেন এমন সময়, নিন্দুক ছিল ঝোপের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়া, সে বলিয়া উঠিল, "মহারাজ, পাখীটাকে দেখিয়াছেন কি ?"

রাজার চমক লাগিল, বলিলেন, "ঐ যা! মনে ত ছিল না! পাখীটাকে দেখা হয় নাই।"

ফিরিয়া আসিয়া পণ্ডিতকে বলিলেন, "পাখীকে তোমরা কেমন শেখাও তার কায়দাটা দেখা চাই!"

দেখা হইল। দেখিয়া বড় খুসি! কায়দাটা পাখীটার চেয়ে এত বেশি বড় যে, পাখীটাকে দেখাই যায় না, মনে হয় তাকে না দেখিলেও চলে। রাজা বুঝিলেন, আয়োজনের ত্রুটি নাই। খাঁচায় দানা নাই পানি নাই, কেবল রাশি রাশি পুঁথি হইতে রাশি রাশি পাতা ছিঁড়িয়া কলমের ডগা দিয়া পাখীর মুখের মধ্যে ঠাসা হইতেছে। গান ত বন্ধই—চীৎকার করিবার ফাঁকটুকু পর্য্যন্ত বোজা। দেখিলে শরীরে রোমাঞ্চ হয়।

এবারে রাজা হাতিতে চড়িবার সময় কানমলা-সর্দ্দারকে বলিয়া দিলেন নিন্দুকের যেন আচ্ছা করিয়া কান মলিয়া দেওয়া হয়।

৬

পাখীটা দিনে দিনে ভদ্রদস্তুর-মত আধমরা হইয়া আসিল। অভিভাবকেরা বুঝিল বেশ আশাজনক। তবু স্বভাবদোষে সকালবেলায় আলোর দিকে পাখী চায় আর অন্যায় রকমে পাখা ঝট্‌পট্‌ করে। এমন কি, এক-একদিন দেখা যায় সে তার রোগা ঠোঁট দিয়া খাঁচার শলা কাটিবার চেষ্টায় আছে।

কোতোয়াল বলিল, "একি বেয়াদবি!"

তখন শিক্ষামহালে হাপর হাতুড়ি আগুন লইয়া কামার আসিয়া হাজির। কি দমাদ্দম পিটানি! লোহার শিকল তৈরি হইল, পাখীর ডানাও গেল কাটা।

রাজার সম্বন্ধীরা মুখ হাঁড়ি করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "এ রাজ্যে পাখীদের কেবল যে আক্কেল নাই তা নয় কৃতজ্ঞতাও নাই।"

তখন পণ্ডিতেরা এক হাতে কলম এক হাতে সড়কি লইয়া এম্‌নি কাণ্ড করিল যাকে বলে শিক্ষা!

কামারের পসার বাড়িয়া কামার-গিন্নির গায়ে সোনাদানা চড়িল এবং কোতোয়ালের হুঁসিয়ারি দেখিয়া রাজা তাকে শিরোপা দিলেন।

৭

পাখীটা মরিল। কোন্‌কালে যে কেউ তা ঠাহর করিতে পারে নাই। নিন্দুক লক্ষ্মীছাড়া রটাইল, "পাখী মরিয়াছে।"

ভাগিনাকে ডাকিয়া রাজা বলিলেন, "ভাগিনা, এ কি কথা শুনি?"

ভাগিনা বলিল, "মহারাজ, পাখীটার শিক্ষা পুরো হইয়াছে।"

রাজা শুধাইলেন, "ও কি আর লাফায়?"

ভাগিনা বলিল, "আরে রাম!"

"আর কি ওড়ে?"

"না।"

"আর কি গান গায়?"

"না।"

"দানা না পাইলে আর কি চেঁচায়?"

"না।"

রাজা বলিলেন, "একবার পাখীটাকে আন ত, দেখি।"

পাখী আসিল। সঙ্গে কোতোয়াল আসিল, পাইক আসিল, ঘোড়সওয়ার আসিল। রাজা পাখীটাকে টিপিলেন। সে হাঁ করিল না, হুঁ করিল না। কেবল

তার পেটের মধ্যে পুঁথির শুকনো পাতা খস্‌খস্ গজ্‌গজ্ করিতে লাগিল।

বাহিরে নববসন্তের দক্ষিণ হাওয়ায় কিশলয়গুলি দীর্ঘনিঃশ্বাসে মুকুলিত বনের আকাশ আকুল করিয়া দিল।

অস্পষ্ট

জান্‌লার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় সাম্‌নের বাড়ির জীবনযাত্রা। রেখা আর ছেদ, দেখা আর না-দেখা দিয়ে সেই ছবি আঁকা।

একদিন পড়ার বই পড়ে রইল, বনমালীর চোখ গেল সেই দিকে।

সেদিন দেখে, সে বাড়ির ঘরকন্নার পুরোনো পটের উপর দু'জন নতুন লোকের চেহারা। একজন বিধবা প্রবীণা, আরেকটি মেয়ের বয়স ষোল হবে, কি সতেরো।

সেই প্রবীণা জানালার ধারে বসে মেয়েটির চুল বেঁধে দিচ্চে, আর মেয়ের চোখ বেয়ে জল পড়চে।

আরেকদিন দেখা গেল চুল বাঁধবার লোকটি নেই। মেয়েটি দিনান্তের শেষ আলোতে ঝুঁকে পড়ে' বোধ হল যেন একটি পুরোনো ফোটোগ্রাফের ফ্রেম আঁচল দিয়ে মাজ্‌চে।

তারপর দেখা যায় জানলার ছেদগুলির মধ্যে দিয়ে ওর প্রতিদিনের কাজের ধারা। কোলের কাছে ধামা নিয়ে ডাল-বাছা ; জাঁতি হাতে স্থপুরি কাটা ; স্নানের পরে বাঁ হাত দিয়ে নেড়ে নেড়ে ভিজে চুল শুকোনো ; বারান্দার রেলিঙের উপরে বালাপোষ রোদ্দুরে মেলে দেওয়া।

ছুপুরবেলায় পুরুষেরা আপিসে ; মেয়েরা কেউ বা ঘুমোয়, কেউ বা তাস খেলে ; ছাতে পায়রার খোপে পায়রাদের বক্‌বকম্ মিইয়ে আসে।

সেই সময়ে মেয়েটি ছাতের চীলে-কোঠায় পা-মেলে বই পড়ে, কোনো দিন বা বইয়ের উপর কাগজ রেখে চিঠি লেখে, আবাঁধা চুল কপালের উপরে থম্‌কে থাকে, আর আঙুল যেন চল্‌তে চল্‌তে চিঠির কানে কানে কথা কয়।

একদিন বাধা পড়ল। সেদিন সে খানিকটা লিখচে চিঠি, খানিকটা খেলচে কলম নিয়ে, আর আল্‌সের উপরে একটা কাক আধ-খাওয়া আমের আঁঠি ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে খাচ্চে।

এমন সময়ে যেন পঞ্চমীর অন্যমনা চাঁদের কণার পিছনে পা টিপে টিপে একটা মোটা মেঘ এসে দাঁড়াল। মেয়েটি আধাবয়সী। তার মোটা হাতে মোটা কাঁকন। তার সাম্‌নের চুল ফাঁক, সেখানে সিঁথির জায়গায় মোটা সিঁদুর আঁকা।

বালিকার কোল থেকে তার না-শেষ-করা চিঠিখানা সে আচম্‌কা ছিনিয়ে নিলে। বাজপাখী হঠাৎ পায়রার পিঠের উপর পড়ল।

ছাতে আর মেয়েটিকে দেখা যায় না। কখনো বা গভীর রাতে কখনো বা সকালে বিকালে ঐ বাড়ি থেকে এমন সব আভাস আসে, যার থেকে বোঝা যায় সংসারটার তলা ফাটিয়ে দিয়ে একটা ভূমিকম্প বেরিয়ে আসবার জন্যে মাথা ঠুক্‌চে।

এদিকে জানলার ফাঁকে ফাঁকে চল্‌চে ডাল বাছা, আর পান সাজা,—ক্ষণে ক্ষণে দুধের কড়া নিয়ে মেয়েটি চলেচে উঠোনে কলতলায়।

এম্‌নি কিছুদিন যায়। সেদিন কার্ত্তিক মাসের সন্ধ্যাবেলা; ছাদের উপর আকাশপ্রদীপ জ্বলেচে, আস্তাবলের ধোঁয়া অজগর সাপের মত পাক দিয়ে আকাশের নিঃশ্বাস বন্ধ করে দিলে।

বনমালী বাইরে থেকে ফিরে এসে যেমনি ঘরের জানলা খুল্‌ল, অমনি তার চোখে পড়ল সেই মেয়েটি ছাদের উপর হাত জোড় করে স্থির দাঁড়িয়ে। তখন গলির শেষ প্রান্তে মল্লিকদের ঠাকুরঘরে আরতির কাঁসর ঘণ্টা বাজ্‌চে। অনেকক্ষণ পরে ভূমিষ্ঠ হয়ে মেঝেতে মাথা ঠুকে ঠুকে বারবার সে প্রণাম করলে; তারপরে চলে গেল।

সেদিন বনমালী নীচে গিয়েই চিঠি লিখ্‌লে। লিখেই নিজে গিয়ে তখনি ডাকবাক্‌সে ফেলে দিয়ে এল।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে একমনে কামনা করতে লাগ্‌ল সে চিঠি যেন না পৌঁছয়। সকালবেলায় উঠে সেই বাড়ির দিকে যেন মুখ তুলে চাইতে পারলে না।

সেই দিনই বনমালী মধুপুরে চলে গেল, কোথায় গেল কাউকে বলে গেল না।

কলেজ খোল্‌বার সময় সময় ফিরে এল। তখন সন্ধ্যাবেলা। সাম্‌নের বাড়ির আগাগোড়া সব বন্ধ, সব অন্ধকার। ওরা সব গেল কোথায়!

বনমালী বলে উঠল, "যাক্‌, ভালই হয়েচে!"

ঘরে ঢুকে দেখে ডেস্কের উপরে একরাশ চিঠি। সব নীচের চিঠির শিরোনাম মেয়েলি হাতের ছাঁদে লেখা, অজানা হাতের অক্ষরে, তাতে পাড়ার পোষ্ট-আপিসের ছাপ।

চিঠিখানি হাতে করে সে বসে রইল। লেফাফা খুল্‌লে না। কেবল আলোর সাম্‌নে তুলে ধরে দেখ্‌লে। জানালার ভিতর দিয়ে জীবনযাত্রার যেমন অস্পষ্ট ছবি, আবরণের ভিতর দিয়ে তেমনি অস্পষ্ট অক্ষর।

একবার খুল্‌তে গেল, তারপরে বাক্সের মধ্যে চিঠিটা রেখে চাবি বন্ধ করে দিলে; শপথ করে বল্‌লে—"এ চিঠি কোনো দিন খুল্‌ব না।"

পট

যে-সহরে অভিরাম দেবদেবীর পট আঁকে, সেখানে কারো কাছে তার পূর্ব্ব পরিচয় নেই। সবাই জানে, সে বিদেশী, পট আঁকা তার চিরদিনের ব্যবসা।

সে মনে ভাবে, ধনী ছিলেম, ধন গিয়েচে, হয়েচে ভালো। দিন-রাত দেবতার রূপ ভাবি, দেবতার প্রসাদে খাই, আর ঘরে ঘরে দেবতার প্রতিষ্ঠা করি। আমার এই মান কে কাড়তে পারে?

এমন সময় দেশের রাজমন্ত্রী মারা গেল। বিদেশ থেকে নতুন এক মন্ত্রীকে রাজা আদর করে আন্‌লে। সেদিন তাই নিয়ে সহরে খুব ধুম।

কেবল অভিরামের তুলি সেদিন চল্‌ল না।

নতুন রাজমন্ত্রী, এই ত সেই কুড়িয়ে-পাওয়া ছেলে, যাকে অভিরামের বাপ মানুষ করে' নিজের ছেলের চেয়ে বেশি বিশ্বাস করেছিল। সেই বিশ্বাস হল সিঁধকাঠি, তাই দিয়ে বুড়োর সর্ব্বস্ব সে হরণ করলে। সেই এল দেশের রাজমন্ত্রী হয়ে।

যে-ঘরে অভিরাম পট আঁকে সেই তার ঠাকুর ঘর; সেখানে গিয়ে হাতজোড় করে' বল্‌লে, "এই জন্যেই কি এতকাল রেখায় রেখায় রঙে রঙে তোমাকে স্মরণ করে এলেম? এতদিনে বর দিলে কি এই অপমান?

২

এমন সময় রথের মেলা বস্‌ল।

সেদিন নানা দেশের নানা লোক তার পট কিন্‌তে এল, সেই ভিড়ের মধ্যে এল একটি ছেলে, তার আগে পিছে লোক-লস্কর।

সে একটি পট বেছে নিয়ে বল্‌লে, "আমি কিন্‌ব।"

অভিরাম তার নফরকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "ছেলেটি কে?"

সে বল্‌লে "আমাদের রাজমন্ত্রীর একমাত্র ছেলে।"

অভিরাম তার পটের উপর কাপড় চাপা দিয়ে বল্‌লে, "বেচব না।"

শুনে ছেলের আবদার আরো বেড়ে উঠ্‌ল। বাড়িতে এসে সে খায় না, মুখ ভার করে থাকে।

অভিরামকে মন্ত্রী থলিভরা মোহর পাঠিয়ে দিলে, মোহরভরা থলি মন্ত্রীর কাছে ফিরে এল।

মন্ত্রী মনে মনে বল্‌লে, "এত বড় স্পর্দ্ধা!"

অভিরামের উপর যতই উৎপাত হতে লাগ্‌ল, ততই সে মনে মনে বল্‌লে, "এই আমার জিৎ।"

৩

প্রতিদিন প্রথম সকালেই অভিরাম তার ইষ্ট দেবতার একখানি করে ছবি আঁকে। এই তার পূজা, আর কোনো পূজা সে জানে না।

একদিন দেখ্‌লে, ছবি তার মনের মত হয় না। কি যেন বদল হয়ে গেচে। কিছুতে তার ভাল লাগে না। তাকে যেন মনে মনে মারে।

দিনে দিনে সেই সূক্ষ্ম বদল স্থূল হয়ে উঠ্‌তে লাগল। একদিন হঠাৎ চম্‌কে উঠে বল্‌লে, "বুঝতে পেরেচি।"

আজ সে স্পষ্ট দেখ্‌লে, দিনে দিনে তার দেবতার মুখ মন্ত্রীর মুখের মত হয়ে উঠ্‌চে।

তুলি মাটিতে ফেলে দিয়ে বল্‌লে, "মন্ত্রীরই জিৎ হল।"

সেই দিনই পট নিয়ে গিয়ে মন্ত্রীকে অভিরাম বল্‌লে, "এই নাও সেই পট, তোমার ছেলেকে দিয়ো।"

মন্ত্রী বল্‌লে, "কত দাম?"

অভিরাম বল্‌লে, "আমার দেবতার ধ্যান তুমি কেড়ে নিয়েছিলে, এই পট দিয়ে সেই ধ্যান ফিরে নেব।"

মন্ত্রী কিছুই বুঝতে পার্‌লে না।

নতুন পুতুল

১

এই গুণী কেবল পুতুল তৈরি কর্‌ত; সে পুতুল রাজবাড়ির মেয়েদের খেলার জন্যে।

বছরে বছরে রাজবাড়ির আঙিনায় পুতুলের মেলা বসে। সেই মেলায় সকল কারিগরই এই গুণীকে প্রধান মান দিয়ে এসেচে।

যখন তার বয়স হল প্রায় চার কুড়ি, এমন সময় মেলায় এক নতুন কারিগর এল। তার নাম কিষণলাল, বয়স তার নবীন, নতুন তার কায়দা।

যে-পুতুল সে গড়ে তার কিছু গড়ে কিছু গড়ে না, কিছু রং দেয় কিছু বাকি রাখে। মনে হয় পুতুলগুলো যেন ফুরোয় নি, যেন কোনোকালে ফুরিয়ে যাবে না।

নবীনের দল বল্‌লে, "লোকটা সাহস দেখিয়েচে।"

প্রবীণের দল বল্‌লে, "এ'কে বলে সাহস? এ ত স্পর্দ্ধা।"

কিন্তু নতুন কালের নতুন দাবী। একালের রাজকন্যারা বলে, "আমাদের এই পুতুল চাই।"

সাবেককালের অনুচরেরা বলে, "আরে ছিঃ।"

শুনে তাদের জেদ বেড়ে যায়।

বুড়োর দোকানে এবার ভিড় নেই। তার ঝাঁকাভরা পুতুল যেন খেয়ার অপেক্ষায় ঘাটের লোকের মত ওপারের দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

এক বছর যায়, দু'বছর যায়, বুড়োর নাম সবাই ভুলেই গেল। কিষণলাল হল রাজবাড়ির পুতুল-হাটের সর্দ্দার।

২

বুড়োর মন ভাঙ্‌ল, বুড়োর দিনও চলে না। শেষকালে তার মেয়ে এসে তাকে বল্‌লে, "তুমি আমার বাড়িতে এস।"

জামাই বল্‌লে, "খাও দাও, আরাম কর, আর সব্‌জির ক্ষেত থেকে গোরু বাছুর খেদিয়ে রাখ।"

বুড়োর মেয়ে থাকে অষ্টপ্রহর ঘরকর্‌নার কাজে। তার জামাই গড়ে মাটির প্রদীপ, আর নৌকো বোঝাই করে সহরে নিয়ে যায়।

নতুন কাল এসেচে সে কথা বুড়ো বোঝে না,

তেমনিই সে বোঝে না যে তার নাৎনীর বয়স হয়েছে ষোলো।

যেখানে গাছতলায় বসে বুড়ো ক্ষেত আগ্‌লায় আর ক্ষণে ক্ষণে ঘুমে ঢুলে পড়ে সেখানে নাৎনী গিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে, বুড়োর বুকের হাড়গুলো পর্য্যন্ত খুসি হয়ে ওঠে। সে বলে, "কি দাদী, কি চাই?"

নাৎনী বলে, "আমাকে পুতুল গড়িয়ে দাও, আমি খেল্‌ব।"

বুড়ো বলে, "আরে ভাই, আমার পুতুল তোর পছন্দ হবে কেন?"

নাৎনী বলে, "তোমার চেয়ে ভাল পুতুল কে গড়ে শুনি?"

বুড়ো বলে, "কেন, কিষণলাল!"

নাৎনী বলে, "ইস্! কিষণলালের সাধ্যি!"

দুজনের এই কথা-কাটাকাটি কতবার হয়েচে। বারে বারে একই কথা!

তারপরে বুড়ো তার ঝুলি থেকে মাল-মসলা বের করে—চোখে মস্ত গোল চষ্‌মাটা আঁটে।

নাৎনীকে বলে, "কিন্তু দাদী, ভুট্টা যে কাকে খেয়ে যাবে!"

নাৎনী বলে, "দাদা আমি কাক তাড়াব।"

বেলা বয়ে যায়; দূরে ইঁদারা থেকে বলদে জল

টানে তার শব্দ আসে; বাংনী কাক তাড়ায়; বুড়ো বসে বসে পুতুল গড়ে।

৩

বুড়োর সকলের চেয়ে ভয় তার মেয়েকে। সেই গিন্নির শাসন বড় কড়া, তার সংসারে সবাই থাকে সাবধানে।

বুড়ো আজ একমনে পুতুল গড়্‌তে বসেচে, হুঁস হল না, পিছন থেকে তার মেয়ে ঘন ঘন হাত দুলিয়ে আস্‌চে।

কাছে এসে যখন সে ডাক দিলে তখন চষ্‌মাটা চোখ থেকে খুলে নিয়ে অবোধ ছেলের মত তাকিয়ে রইল।

মেয়ে বল্‌লে, "দুধ দোয়া পড়ে থাক্, আর তুমি সুভদ্রাকে নিয়ে বেলা বইয়ে দাও! অত বড় মেয়ে, ওর কি পুতুল খেলার বয়স!"

বুড়ো তাড়াতাড়ি বলে উঠ্‌ল, "সুভদ্রা খেল্‌বে কেন? এ পুতুল রাজবাড়িতে বেচ্‌ব। আমার দাদীর যেদিন বর আস্‌বে সেদিন ত ওর গলায় মোহরের মালা পরাতে হবে। আমি তাই টাকা জমাতে চাই।"

মেয়ে বিরক্ত হয়ে বল্‌লে, "রাজবাড়িতে এ পুতুল কিন্‌বে কে?"

বুড়োর মাথা হেঁট হয়ে গেল। চুপ করে বসে রইল।

সুভদ্রা মাথা নেড়ে বল্‌লে, "দাদার পুতুল রাজবাড়িতে কেমন না কেনে দেখ্‌ব!"

৪

ছুদিন পরে সুভদ্রা এক কাহন সোনা এনে মাকে বল্‌লে, "এই নাও আমার দাদার পুতুলের দাম।"

মা বল্‌লে, "কোথায় পেলি?"

মেয়ে বল্‌লে, "রাজপুরীতে গিয়ে বেচে এসেচি।"

বুড়ো হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে, "দাদী, তবু ত তোর দাদা এখন চোখে ভাল দেখে না, তার হাত কেঁপে যায়!"

মা খুসি হয়ে বল্‌লে, "এমন ষোলোটা মোহর হলেই ত সুভদ্রার গলার হার হবে।"

বুড়ো বল্‌লে, "তার আর ভাবনা কি?"

সুভদ্রা বুড়োর গলা জড়িয়ে ধরে বল্‌লে, "দাদাভাই, আমার বরের জন্যে ত ভাবনা নেই।"

বুড়ো হাস্‌তে লাগ্‌ল, আর চোখ থেকে একফোঁটা জল মুছে ফেল্‌লে।

৫

বুড়োর যৌবন যেন ফিরে এল। সে গাছের তলায় বসে পুতুল গড়ে আর সুভদ্রা কাক তাড়ায়, আর দূরে ইঁদারায় বলদে কঁ্যা-কোঁ করে জল টানে।

একে একে ষোলোটা মোহর গাঁথা হল, হার পূর্ণ হয়ে উঠ্‌ল।

মা বল্‌লে, "এখন বর এলেই হয়।"

সুভদ্রা বুড়োর কানে কানে বল্‌লে, "দাদাভাই, বর ঠিক আছে।"

দাদা বল্‌লে, "বল্ ত দাদী, কোথায় পেলি বর।"

সুভদ্রা বল্‌লে, "যেদিন রাজপুরীতে গেলেম, দ্বারী বল্‌লে কি চাও? আমি বল্‌লেম, রাজকন্যাদের কাছে পুতুল বেচ্‌তে চাই। সে বল্‌লে, এ পুতুল এখনকার দিনে চল্‌বে না,—বলে' আমাকে ফিরিয়ে দিলে। একজন মানুষ আমার কান্না দেখে বল্‌লে, দাও ত, ঐ পুতুলের একটু সাজ ফিরিয়ে দিই, বিক্রি হয়ে যাবে। সেই মানুষটিকে তুমি যদি পছন্দ কর, দাদা, তাহলে আমি তার গলায় মালা দিই।"

বুড়ো জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "সে আছে কোথায়?"

নাৎনী বল্‌লে, "ঐ যে বাইরে পিয়াল গাছের তলায়।"

বর এল ঘরের মধ্যে, বুড়ো বল্‌লে, "এ যে কিষণলাল।"

কিষণলাল বুড়োর পায়ের ধূলো নিয়ে বল্‌লে, "হাঁ, আমি কিষণলাল।"

বুড়ো তাকে বুকে চেপে ধরে বল্‌লে, "ভাই, একদিন তুমি কেড়ে নিয়েছিলে আমার হাতের পুতুলকে, আজ নিলে আমার প্রাণের পুতুলটিকে।"

নাৎনী বুড়োর গলা ধরে তার কানে কানে বল্‌লে, "দাদা, তোমাকে সুদ্ধ।"

উপসংহার

১

ভোজরাজের দেশে যে-মেয়েটি ভোর বেলাতে দেবমন্দিরে গান গাইতে যায় সে কুড়িয়ে-পাওয়া মেয়ে।

আচার্য্য বলেন, "একদিন শেষরাত্রে আমার কানে একখানি সুর লাগ্‌ল। তার পরে সেইদিন যখন সাজি নিয়ে পারুল-বনে ফুল তুল্‌তে গেছি তখন এই মেয়েটিকে ফুলগাছতলায় কুড়িয়ে পেলেম।"

সেই অবধি আচার্য্য মেয়েটিকে আপন তম্বুরাটির মত কোলে নিয়ে মানুষ করেচে; এর মুখে যখন কথা ফোটেনি এর গলায় তখন গান জাগ্‌ল।

আজ আচার্য্যের কণ্ঠ ক্ষীণ, চোখে ভাল দেখেন না। মেয়েটি তাঁকে শিশুর মত মানুষ করে।

কত যুবা দেশ বিদেশ থেকে এই মেয়েটির গান শুনতে আসে। তাই দেখে মাঝে মাঝে আচার্য্যের

বুক কেঁপে ওঠে, বলেন,—"যে বোঁটা আল্‌গা হয়ে আসে ফুলটি তাকে ছেড়ে যায়।"

মেয়েটি বলে, "তোমাকে ছেড়ে আমি এক পলক বাঁচি নে।"

আচার্য্য তার মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে বলেন, "যে গান আজ আমার কণ্ঠ ছেড়ে গেল, সেই গান তোরই মধ্যে রূপ নিয়েচে। তুই যদি ছেড়ে যাস্ তা হলে আমার চিরজন্মের সাধনাকে আমি হারাব।"

২

ফাগুন পূর্ণিমায় আচার্য্যের প্রধান শিষ্য কুমার-সেন গুরুর পায়ে একটি আমের মঞ্জরী রেখে প্রণাম কর্‌লে। বল্‌লে, "মাধবীর হৃদয় পেয়েচি এখন প্রভুর যদি সম্মতি পাই তা হলে দুজনে মিলে আপনার চরণ সেবা করি।"

আচার্য্যের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগ্‌ল। বল্‌লে, "আন দেখি আমার তম্বুরা। আর তোমরা দুইজনে রাজার মত রাণীর মত আমার সামনে এসে বস।"

তম্বুরা নিয়ে আচার্য্য গান গাইতে বস্‌লেন। দুলহা দুলহীর গান সাহানার সুরে। বল্‌লেন, "আজ আমার জীবনের শেষ গান গাব।"

এক পদ গাইলেন। গান আর এগোয় না, বৃষ্টির ফোঁটায় ভেরে'-ওঠা জুঁই ফুলটির মত হাওয়ায় কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে খসে পড়ে। শেষে তম্বুরাটি কুমার সেনের হাতে দিয়ে বল্‌লেন, "বৎস, এই লও আমার যন্ত্র।"

তারপরে মাধবীর হাতখানি তার হাতে তুলে দিয়ে বল্‌লেন, "এই লও আমার প্রাণ।"

তার পরে বল্‌লেন, "আমার গানটি দুজনে মিলে শেষ করে দাও, আমি শুনি।"

মাধবী আর কুমার গান ধর্‌লে—সে যেন আকাশ আর পূর্ণচাঁদের কণ্ঠ মিলিয়া গাওয়া।

৩

এমন সময়ে দ্বারে এল রাজদূত, গান থেমে গেল।

আচার্য্য কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে আসন থেকে উঠে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "মহারাজের কি আদেশ?"

দূত বল্‌লে, "তোমার মেয়ের ভাগ্য প্রসন্ন, মহারাজ তাকে ডেকেচেন।"

আচার্য্য জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "কি ইচ্ছা তাঁর?"

দূত বল্‌লে, "আজ রাত পোয়ালে রাজকন্যা কাম্বোজে পতিগৃহে যাত্রা কর্‌বেন, মাধবী তাঁর সঙ্গিনী হয়ে যাবে।"

রাত পোয়াল, রাজকন্যা যাত্রা কর্‌লে।

মহিষী মাধবীকে ডেকে বল্‌লে, "আমার মেয়ে প্রবাসে গিয়ে যাতে প্রসন্ন থাকে সে ভার তোমার উপরে।"

মাধবীর চোখে জল পড়ল না, কিন্তু অনাবৃষ্টির আকাশ থেকে যেন রৌদ্র ঠিক্‌রে পড়ল।

৪

রাজকন্যার ময়ূরপংখী আগে যায়, আর তার পিছে পিছে যায় মাধবীর পাল্কী। সে পাল্কী কিংখাবে ঢাকা, তার দুই পাশে পাহারা।

পথের ধারে ধূলোর উপরে ঝড়ে-ভাঙা অশ্বত্থ ডালের মত পড়ে রইলেন আচার্য্য, আর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কুমারসেন।

পাখীরা গান গাইছিল পলাশের ডালে; আমের বোলের গন্ধে বাতাস বিহ্বল হয়ে উঠেছিল। পাছে রাজকন্যার মন প্রবাসে কোনোদিন ফাগুন সন্ধ্যায় হঠাৎ নিমেষের জন্য উতলা হয় এই চিন্তায় রাজপুরীর লোকে নিঃশ্বাস ফেল্‌লে।

পুনরাবৃত্তি

১

সেদিন যুদ্ধের খবর ভাল ছিল না। রাজা বিমর্ষ হয়ে বাগানে বেড়াতে গেলেন।

দেখ্‌তে পেলেন প্রাচীরের কাছে গাছতলায় বসে খেলা কর্‌চে একটি ছোট ছেলে, আর একটি ছোট মেয়ে।

রাজা তাদের জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "তোমরা কি খেল্‌চ ?"

তারা বল্‌লে, "আমাদের আজকের খেলা রাম-সীতার বনবাস।"

রাজা সেখানে বসে গেলেন।

ছেলেটি বল্লে, "এই আমাদের দণ্ডক বন, এখানে কুটীর বাঁধচি।"

সে একরাশ ভাঙা ডালপালা খড় ঘাস জুটিয়ে এনেচে, ভারি ব্যস্ত।

আর মেয়েটি শাক-পাতা নিয়ে খেলার হাঁড়িতে বিনা আগুনে রাঁধচে ; রাম খাবেন, তারি আয়োজনে সীতার একদণ্ড সময় নেই।

রাজা বল্‌লেন, "আর ত সব দেখ্‌চি, কিন্তু রাক্ষস কোথায় ?"

ছেলেটীকে মানতে হল তাদের দণ্ডক বনে কিছু কিছু ত্রুটি আছে।

রাজা বল্‌লেন, "আচ্ছা, আমি হ'ব রাক্ষস।"

ছেলেটি তাঁকে ভাল করে দেখ্‌লে। তার পরে বল্‌লে, "তোমাকে কিন্তু হেরে যেতে হবে।"

রাজা বল্‌লেন, "আমি খুব ভাল হারতে পারি। পরীক্ষা করে দেখ।"

সেদিন রাক্ষসবধ এতই সুচারুরূপে হতে লাগ্‌ল যে, ছেলেটি কিছুতে রাজাকে ছুটি দিতে চায় না। সেদিন এক বেলাতে তাঁকে দশ বারোটা রাক্ষসের মরণ একলা মর্‌তে হল। মর্‌তে মর্‌তে হাঁপিয়ে উঠ্‌লেন।

ত্রেতাযুগে পঞ্চবটীতে যেমন পাখী ডেকেছিল সেদিন সেখানে ঠিক তেমনি করেই ডাকতে লাগ্‌ল। ত্রেতাযুগে সবুজ পাতার পর্দায় পর্দায় প্রভাত আলো যেমন কোমল ঠাটে আপন সুর বেঁধে নিয়েছিল আজও ঠিক সেই সুরই বাঁধলে।

রাজার মন থেকে ভার নেমে গেল।

মন্ত্রীকে ডেকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন "ছেলে মেয়ে দুটি কার ?"

মন্ত্রী বল্‌লে, "মেয়েটি আমারই, নাম রুচিরা। ছেলের নাম কৌশিক, ওর বাপ গরীব ব্রাহ্মণ, দেব-পূজা করে' দিন চলে।"

রাজা বল্‌লেন, "যখন সময় হবে এই ছেলেটির সঙ্গে ঐ মেয়ের বিবাহ হয় এই আমার ইচ্ছা।"

শুনে মন্ত্রী উত্তর দিতে সাহস করলে না, মাথা হেঁট করে রইল।

২

দেশে সব চেয়ে যিনি বড় পণ্ডিত রাজা তাঁর কাছে কৌশিককে পড়তে পাঠালেন। যত উচ্চ বংশের ছাত্র তাঁর কাছে পড়ে। আর পড়ে রুচিরা।

কৌশিক যেদিন তাঁর পাঠশালায় এল সেদিন অধ্যাপকের মন প্রসন্ন হল না। অন্য সকলেও লজ্জা পেলে। কিন্তু রাজার ইচ্ছা।

সকলের চেয়ে সঙ্কট রুচিরার। কেন না, ছেলেরা কানাকানি করে। লজ্জায় তার মুখ লাল হয়, রাগে তার চোখ দিয়ে জল পড়ে।

কৌশিক যদি কখনো তাকে পুঁথি এগিয়ে দেয়, সে পুঁথি ঠেলে ফেলে। যদি তাকে পাঠের কথা বলে সে উত্তর করে না।

রুচির প্রতি অধ্যাপকের স্নেহের সীমা ছিল না। কৌশিককে সকল বিষয়ে সে এগিয়ে যাবে এই ছিল তাঁর প্রতিজ্ঞা, রুচিরও সেই ছিল পণ।

মনে হল সেটা খুব সহজেই ঘটবে, কারণ, কৌশিক পড়ে বটে কিন্তু এক মনে নয়। তার সাঁতার কাটতে মন, তার বনে বেড়াতে মন, সে গান করে, সে যন্ত্র বাজায়।

অধ্যাপক তাকে ভর্ৎসনা করে' বলেন, "বিদ্যায় তোমার অনুরাগ নেই কেন?"

সে বলে, "আমার অনুরাগ শুধু বিদ্যায় নয়, আরো নানা জিনিষে।"

অধ্যাপক বলেন, "সে সব অনুরাগ ছাড়।"

সে বলে, "তাহলে বিদ্যার প্রতিও আমার অনুরাগ থাকবে না।"

৩

এমনি করে কিছুকাল যায়।

রাজা অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার ছাত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?"

অধ্যাপক বল্‌লেন, "রুচিরা।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন "আর কৌশিক ?"

অধ্যাপক বল্‌লেন, "সে যে কিছুই শিখেচে এমন বোধ হয় না।"

রাজা বল্‌লেন, "আমি কৌশিকের সঙ্গে রুচির বিবাহ ইচ্ছা করি।"

অধ্যাপক একটু হাস্‌লেন, বল্‌লেন, "এ যেন গোধূলীর সঙ্গে উষার বিবাহের প্রস্তাব।"

রাজা মন্ত্রীকে ডেকে বল্‌লেন, "তোমার কন্যার সঙ্গে কৌশিকের বিবাহে বিলম্ব উচিত নয়।"

মন্ত্রী বল্‌লে, "মহারাজ, আমার কন্যা এ বিবাহে অনিচ্ছুক।"

রাজা বল্‌লেন, "স্ত্রীলোকের মনের ইচ্ছা কি মুখের কথায় বোঝা যায় ?"

মন্ত্রী বল্‌লে, "তার চোখের জলও যে সাক্ষ্য দিচ্চে।"

রাজা বললেন, "সে কি মনে করে কৌশিক তার অযোগ্য।"

মন্ত্রী বললে, "হাঁ, সেই কথাই বটে।"

রাজা বল্‌লেন, "আমার সামনে দুজনের বিদ্যার পরীক্ষা হোক্। কৌশিকের জয় হলে এই বিবাহ সম্পন্ন হবে।"

পরদিন মন্ত্রী রাজাকে এসে বল্‌লে, "এই পণে আমার কন্যার মত আছে।"

৪

বিচারসভা প্রস্তুত। রাজা সিংহাসনে বসে’, কৌশিক তাঁর সিংহাসনতলে।

স্বয়ং অধ্যাপক রুচিকে সঙ্গে করে উপস্থিত হলেন। কৌশিক আসন ছেড়ে উঠে’ তাঁকে প্রণাম ও রুচিকে নমস্কার করলে। রুচি দৃক্‌পাত করল না।

কোনোদিন পাঠশালার রীতি পালনের জন্যেও কৌশিক রুচির সঙ্গে তর্ক করে নি। অন্য ছাত্রেরাও অবজ্ঞা করে’ তাকে তর্কের অবকাশ দিত না। তাই আজ যখন তার যুক্তির মুখে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ তীরের ফলায় আলোর মত ঝিকমিক করে উঠ্‌ল তখন গুরু বিস্মিত হলেন, এবং বিরক্ত হলেন। রুচির কপালে ঘাম দেখা দিল, সে বুদ্ধি স্থির রাখ্‌তে পারলে না। কৌশিক তাকে পরাভবের শেষ কিনারায় নিয়ে গিয়ে তবে ছেড়ে দিলে।

ক্রোধে অধ্যাপকের বাক্‌রোধ হল, আর রুচির চোখ দিয়ে ধারা বেয়ে জল পড়তে লাগল।

রাজা মন্ত্রীকে বল্‌লেন, “এখন বিবাহের দিন স্থির কর।”

কৌশিক আসন ছেড়ে উঠে জোড় হাতে রাজাকে বল্‌লে, “ক্ষমা করবেন, এ বিবাহ আমি করব না।”

রাজা বিস্মিত হয়ে বল্‌লেন, "জয়লব্ধ পুরস্কার গ্রহণ করবে না ?"

কৌশিক বল্‌লে, "জয় আমারই থাক্ পুরস্কার অন্যের হোক্।"

অধ্যাপক বল্‌লেন, "মহারাজ আর এক বছর সময় : তার পরে শেষ পরীক্ষা।"

সেই কথাই স্থির হল।

৫

কৌশিক পাঠশালা ত্যাগ করে গেল। কোনো-দিন সকালে তাকে বনের ছায়ায় কোনোদিন সন্ধ্যায় তাকে পাহাড়ের চূড়ার উপর দেখা যায়।

এদিকে রুচির শিক্ষায় অধ্যাপক সমস্ত মন দিলেন। কিন্তু রুচির সমস্ত মন কোথায় ?

অধ্যাপক বিরক্ত হয়ে বল্‌লেন, "এখনো যদি সতর্ক না হও তবে দ্বিতীয় বার তোমাকে লজ্জা পেতে হবে।"

দ্বিতীয় বার লজ্জা পাবার জন্যেই যেন সে তপস্যা করতে লাগল। অপর্ণার তপস্যা যেমন অনশনের, রুচির তপস্যা তেমনি অনধ্যায়ের। ষড়্‌দর্শনের পুঁথি তার বন্ধই রইল, এমন কি, কাব্যের পুঁথিও দৈবাৎ খোলা হয়।

অধ্যাপক রাগ করে' বল্‌লেন, "কপিল কণাদের নামে শপথ করে' বলচি আর কখনো স্ত্রীলোক ছাত্র নেব না। বেদবেদান্তের পার পেয়েচি, স্ত্রীজাতির মন বুঝতে পারলেম না।"

একদা মন্ত্রী এসে রাজাকে বল্‌লে, "ভবদত্তর বাড়ি থেকে কন্যার সম্বন্ধ এসেচে। কুলে শীলে ধনে মানে তারা অদ্বিতীয়। মহারাজের সম্মতি চাই।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "কন্যা কি বলে ?"

মন্ত্রী বল্‌লে, "মেয়েদের মনের ইচ্ছা কি মুখের কথায় বোঝা যায় ?"

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "তার চোখের জল আজ কি রকম সাক্ষ্য দিচ্চে ?"

মন্ত্রী চুপ করে রইল।

৬

রাজা তাঁর বাগানে এসে বস্‌লেন। মন্ত্রীকে বল্‌লেন, "তোমার মেয়েকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।"

রুচিরা এসে রাজাকে প্রণাম করে দাঁড়ালে।

রাজা বল্‌লেন, "বৎসে, সেই রামের বনবাসের খেলা মনে আছে ?"

রুচিরা স্মিতমুখে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

রাজা বল্‌লে, "আজ সেই রামের বনবাস খেলা আর একবার দেখ্‌তে আমার বড় সাধ।"

রুচিরা মুখের একপাশে আঁচল টেনে চুপ করে রইল।

রাজা বল্‌লেন, "বনও আছে রামও আছে, কিন্তু শুনচি, বৎসে, এবার সীতার অভাব ঘটেচে। তুমি মনে করলেই সে অভাব পূরণ হয়।"

রুচিরা কোন কথা না বলে' রাজার পায়ের কাছে নত হয়ে প্রণাম করলে।

রাজা বল্‌লেন, "কিন্তু বৎসে, এবার আমি রাক্ষস সাজ্‌তে পারব না।"

রুচিরা স্নিগ্ধ চক্ষে রাজার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

রাজা বল্‌লেন, "এবার রাক্ষস সাজ্‌বে তোমাদের অধ্যাপক।"

সিদ্ধি

১

স্বর্গের অধিকারে মানুষ বাধা পাবে না এই তার পণ। তাই কঠিন সন্ধানে অমর হবার মন্ত্র সে শিখে নিয়েছে। এখন একলা বনের মধ্যে সেই মন্ত্র সে সাধনা করে।

বনের ধারে ছিল এক কাঠকুড়নী মেয়ে। সে মাঝে মাঝে আঁচলে করে' তার জন্যে ফল নিয়ে আসে, আর পাতার পাত্রে আনে ঝরনার জল।

ক্রমে তপস্যা এত কঠোর হল যে, ফল সে আর ছোঁয়না, পাখীতে এসে ঠুক্‌রে খেয়ে যায়।

আরো কিছুদিন গেল। তখন ঝরনার জল পাতার পাত্রেই শুকিয়ে যায়, মুখে ওঠেনা।

কাঠকুড়নি মেয়ে বলে, "এখন আমি করব কি? আমার সেবা যে বৃথা হতে চলল।"

তার পর থেকে ফুল তুলে সে তপস্বীর পায়ের কাছে রেখে যায়, তপস্বী জান্‌তেও পারে না।

মধ্যাহ্নে রোদ যখন প্রখর হয় সে আপন আঁচলটি তুলে' ধরে' ছায়া করে' দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু তপস্বীর কাছে রোদও যা ছায়াও তা।

কৃষ্ণপক্ষের রাতে অন্ধকার যখন ঘন হয় কাঠকুড়নি সেখানে জেগে বসে থাকে। তাপসের কোনো ভয়ের কারণ নেই তবু সে পাহারা দেয়।

২

একদিন এমন ছিল যখন এই কাঠকুড়নির সঙ্গে দেখা হলে নবীন তপস্বী স্নেহ করে' জিজ্ঞাসা করত, "কেমন আছ?"

কাঠকুড়নি বলত, "আমার ভালই কি আর মন্দই কি? কিন্তু তোমাকে দেখবার লোক কি কেউ নেই? তোমার মা, তোমার বোন?"

সে বলত, "আছে সবাই, কিন্তু আমাকে দেখে' হবে কি? তারা কি আমায় চিরদিন বাঁচিয়ে রাখ্‌তে পারবে?"

কাঠকুড়নি বলত, “প্রাণ থাকে না বলেই ত প্রাণের জন্যে এত দরদ।”

তাপস বল্‌ত, “আমি খুঁজি চিরদিন বাঁচবার পথ। মানুষকে আমি অমর করব।”

এই বলে’ সে কত কি বলে’ যেত ; তার নিজের সঙ্গে নিজের কথা, সে কথার মানে বুঝবে কে ?

কাঠকুড়নি বুঝত না, কিন্তু আকাশে নবমেঘের ডাকে ময়ূরীর যেমন হয় তেমনি তার মন ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ত।

তার পরে আরো কিছুদিন যায়। তপস্বী মৌন হয়ে এল, মেয়েকে কোনো কথা বলে না।

তার পরে আরো কিছুদিন যায়। তপস্বীর চোখ বুজে এল, মেয়েটির দিকে চেয়ে দেখে না।

মেয়ের মনে হল সে আর ঐ তাপসের মাঝখানে যেন তপস্যার লক্ষযোজন ক্রোশের দূরত্ব। হাজার হাজার বছরেও এতটা বিচ্ছেদ পার হয়ে একটুখানি কাছে আসবার আশা নেই।

তা নাইবা রইল আশা। তবু ওর কান্না আসে, মনে মনে বলে, দিনে একবার যদি বলেন, কেমন আছ, তাহলে সেই কথাটুকুতে দিন কেটে যায়, একবেলা যদি একটু ফল আর জল গ্রহণ করেন তাহলে অন্নজল ওর নিজের মুখে রোচে।

৩

এদিকে ইন্দ্রলোকে খবর পৌঁছল, মানুষ মর্ত্ত্যকে লঙ্ঘন করে' স্বর্গ পেতে চায়—এত বড় স্পর্দ্ধা !

ইন্দ্র প্রকাশ্যে রাগ দেখালেন, গোপনে ভয় পেলেন। বল্‌লেন, "দৈত্য স্বর্গ জয় করতে চেয়েছিল বাহুবলে, তার সঙ্গে লড়াই চলেছিল ; মানুষ স্বর্গ নিতে চায় দুঃখের বলে, তার কাছে কি হার মান্‌তে হবে ?"

মেনকাকে মহেন্দ্র বল্‌লেন, "যাও, তপস্যা ভঙ্গ করগে।"

মেনকা বল্‌লেন, "সুররাজ, স্বর্গের অস্ত্রে মর্ত্ত্যের মানুষকে যদি পরাস্ত করেন তবে তাতে স্বর্গের পরাভব। মানবের মরণবাণ কি মানবীর হাতে নেই ?"

ইন্দ্র বল্‌লেন, "সে কথা সত্য।"

৪

ফাল্গুন মাসে দক্ষিণ হাওয়ার দোলা লাগ্‌তেই মর্ম্মরিত মাধবীলতা প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। তেমনি ঐ

কাঠকুড়নির উপরে একদিন নন্দনবনের হাওয়া এসে লাগল, আর তার দেহ মন একটা কোন্ উৎসুক মাধুর্য্যের উন্মেষে উন্মেষে ব্যথিত হয়ে উঠ্ল। তার মনের ভাবনাগুলি চাক-ছাড়া মৌমাছির মত উড়্তে লাগ্ল, কোথা তারা মধুগন্ধ পেয়েচে।

ঠিক সেই সময়ে সাধনার একটা পালা শেষ হল। এইবার তাকে যেতে হবে নির্জ্জন গিরিগুহায়। তাই সে চোখ মেলল।

সামনে দেখে সেই কাঠকুড়নি মেয়েটি খোঁপায় পরেচে একটি অশোকের মঞ্জরী, আর তার গায়ের কাপড়খানি কুসুম্ভ ফুলে রং করা। যেন তাকে চেনা যায় অথচ চেনা যায় না। যেন সে এমন একটি জানা সুর যার পদগুলি মনে পড়চে না। যেন সে এমন একটি ছবি যা-কেবল রেখায় টানা ছিল—চিত্রকর কোন্ খেয়ালে কখন্ এক সময়ে তাতে রং লাগিয়েচে।

তাপস আসন ছেড়ে উঠল। বল্লে, "আমি দূর দেশে যাব।"

কাঠকুড়নি জিজ্ঞাসা করলে, "কেন প্রভু?"

তপস্বী বললে, "তপস্যা সম্পূর্ণ করবার জন্যে।"

কাঠকুড়নি হাত জোড় করে বল্লে, "দর্শনের পুণ্য হতে আমাকে কেন বঞ্চিত করবে?"

তপস্বী আবার আসনে বসল, অনেকক্ষণ ভাব্‌ল, আর কিছু বল্‌ল না।

৫

তার অনুরোধ যেমনি রাখা হল অমনি মেয়েটির বুকের একধার থেকে আর-একধারে বারে বারে যেন বজ্রসূচি বিঁধ্‌তে লাগ্‌ল।

সে ভাব্‌লে, "আমি অতি সামান্য, তবু আমার কথায় কেন বাধা ঘট্‌বে ?"

সেই রাতে পাতার বিছানায় একলা জেগে বসে' তার নিজেকে নিজের ভয় করতে লাগল।

তার পর দিন সকালে সে ফল এনে দাঁড়াল, তাপস হাত পেতে নিলে। পাতার পাত্রে জল এনে দিতেই তাপস জল পান করলে। সুখে তার মন ভরে' উঠল।

কিন্তু তার পরেই নদীর ধারে শিরীষ গাছের ছায়ায় তার চোখের জল আর থামতে চায় না। কি ভাব্‌লে কি জানি!

পরদিন সকালে কাঠকুড়নি তাপসকে প্রণাম করে বল্‌লে, "প্রভু, আশীর্ব্বাদ চাই।"

তপস্বী জিজ্ঞাসা করলে, "কেন?"

মেয়েটি বল্‌লে, "আমি বহু দূর দেশে যাব।"

তপস্বী বল্‌লে, "যাও, তোমার সাধনা সিদ্ধ হোক্।"

৬

একদিন তপস্যা পূর্ণ হ'ল।

ইন্দ্র এসে বল্‌লেন, "স্বর্গের অধিকার তুমি লাভ করেচ।"

তপস্বী বল্‌লে, "তাহ'লে আর স্বর্গে প্রয়োজন নেই।"

ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, "কি চাও?"

তপস্বী বল্‌লে, "এই বনের কাঠকুড়নিকে।"

প্রথম চিঠি

১

বধূর সঙ্গে তার প্রথম মিলন, আর তার পরেই সে এই প্রথম এসেচে প্রবাসে।

চলে' যখন আসে তখন বধূর লুকিয়ে কান্নাটি ঘরের আয়নার মধ্যে দিয়ে চকিতে ওর চোখে পড়্‌ল। মন বল্‌লে, "ফিরি, দুটো কথা বলে' আসি।" কিন্তু সেটুকু সময় ছিল না।

সে দূরে আস্‌বে বলে' একজনের দুটি চোখ বয়ে জল পড়ে, তাঁর জীবনে এমন সে আর কখনো দেখে নি।

পথে চল্‌বার সময় তার কাছে পড়ন্ত রোদ্দুরে এই পৃথিবী প্রেমের ব্যথায় ভরা হয়ে দেখা দিল। সেই অসীম ব্যথার ভাণ্ডারে তার মত একটি মানুষেরও নিমন্ত্রণ আছে এই কথা মনে করে' বিস্ময়ে তার বুক ভরে' উঠ্‌ল।

যেখানে সে কাজ করতে এসেচে সে পাহাড়। সেখানে দেবদারুর ছায়া বেয়ে বাঁকা পথ নীরব মিনতির মত পাহাড়কে জড়িয়ে ধরে, আর ছোট ছোট ঝরণা কা'কে যেন আড়ালে আড়ালে খুঁজে বেড়ায়, লুকিয়ে চুরিয়ে।

আয়নার মধ্যে যে ছবিটি দেখে' এসেছিল আজ প্রকৃতির মধ্যে প্রবাসী সেই ছবিরই আভাস দেখে, নববধূর গোপন ব্যাকুলতার ছবি।

২

আজ দেশ থেকে তার স্ত্রীর প্রথম চিঠি এল।

লিখেচে, "তুমি কবে ফিরে আস্‌বে? এসো, এসো, শীঘ্র এসো। তোমার দুটি পায়ে পড়ি।"

এই আসা-যাওয়ার সংসারে তারও চলে' যাওয়া আর তারও ফিরে আসার যে এত দাম ছিল একথা কে জান্‌ত? সেই দুটি আতুর চোখের চাউনির সাম্‌নে সে নিজেকে দাঁড় করিয়ে দেখ্‌লে, আর তার মন বিস্ময়ে ভরে' উঠ্‌ল।

ভোর বেলায় উঠে' চিঠিখানি নিয়ে দেবদারুর ছায়ায় সেই বাঁকা পথে সে বেড়াতে বেরল। চিঠির পরশ তার হাতে লাগে, আর কানে যেন সে শুন্‌তে

পায়, "তোমাকে না দেখ্‌তে পেয়ে আমার জগতের সমস্ত আকাশ কান্নায় ভেসে গেল।"

মনে মনে ভাব্‌তে লাগ্‌ল, "এত কান্নার মূল্য কি আমার মধ্যে আছে?"

৩

এমন সময় সূর্য্য উঠ্‌ল পূর্ব্বদিকের নীল পাহাড়ের শিখরে। দেবদারুর শিশির-ভেজা পাতার ঝালরের ভিতর দিয়ে আলো ঝিল্‌মিল্ করে' উঠ্‌ল।

হঠাৎ চারটি বিদেশিনী মেয়ে দুই কুকুর সঙ্গে নিয়ে রাস্তার বাঁকের মুখে তার সাম্‌নে এসে পড়ল। কি জানি কি ছিল তার মুখে, কিম্বা তার সাজে, কিম্বা তার চালচলনে,—বড় মেয়ে দুটি কৌতুকে মুখ একটুখানি বাঁকিয়ে চলে' গেল। ছোট মেয়ে দুটি হাসি চাপ্‌বার চেষ্টা করলে, চাপ্‌তে পারলে না; দুজনে দুজনকে ঠেলাঠেলি করে' খিল্‌খিল করে' হেসে ছুটে গেল।

কঠিন কৌতুকের হাসিতে ঝরনাগুলিরও সুর ফিরে গেল। তারা হাততালি দিয়ে উঠ্‌ল। প্রবাসী মাথা হেঁট করে' চলে আর ভাবে—"আমার দেখার মূল্য কি এই হাসি?"

সেদিন রাস্তায় চলা তার আর হ'ল না। বাসায় ফিরে গেল; একলা ঘরে বসে' চিঠিখানি খুলে পড়লে, "তুমি কবে ফিরে আস্‌বে? এসো, এসো, শীঘ্র এসো, তোমার ছুটি পায়ে পড়ি!"

রথযাত্রা

রথযাত্রার দিন কাছে।

তাই রাণী রাজাকে বল্‌লে, "চল রথ দেখ্‌তে যাই।"

রাজা বল্‌লে, "আচ্ছা।"

ঘোড়াশাল থেকে ঘোড়া বেরল, হাতিশাল থেকে হাতী। ময়ুর-পংখী যায় সারে সারে, আর বল্লম-হাতে সারে সারে সিপাই সান্ত্রী। দাস দাসী দলে দলে পিছে পিছে চল্‌ল।

কেবল বাকি রইল একজন। রাজবাড়ির ঝাঁটার-কাঠি কুড়িয়ে আনা তার কাজ।

সর্দ্দার এসে দয়া করে' তাকে বল্‌লে, "ওরে তুই যাবি ত আয়।"

সে হাত জোড় করে' বল্‌লে, "আমার যাওয়া ঘট্‌বে না।"

রাজার কানে কথা উঠ্‌ল, সবাই সঙ্গে যায় কেবল সেই দুঃখীটা যায় না।

রাজা দয়া করে' মন্ত্রীকে বল্‌লে, "ওকেও ডেকে নিয়ো।"

রাস্তার ধারে তার বাড়ি। হাতী যখন সেই-

খানে পৌঁছল মন্ত্রী তাকে ডেকে বল্‌লে, “ওরে দুঃখী, ঠাকুর দেখ্‌বি চল্‌।”

সে হাত জোড় করে’ বল্‌ল, “কত চল্‌ব? ঠাকুরের দুয়ার পর্য্যন্ত পৌঁছই এমন সাধ্য কি আমার আছে?”

মন্ত্রী বল্‌লে, “ভয় কিরে তোর, রাজার সঙ্গে চল্‌বি।”

সে বল্‌লে, “সর্ব্বনাশ! রাজার পথ কি আমার পথ?”

মন্ত্রী বল্‌লে, “তবে তোর উপায়? তোর ভাগ্যে কি রথযাত্রা দেখা ঘট্‌বে না?”

সে বল্‌লে, “ঘট্‌বে বই কি! ঠাকুর ত রথে করেই আমার দুয়ারে আসেন।”

মন্ত্রী হেসে উঠ্‌ল। বল্‌লে, “তোর দুয়ারে রথের চিহ্ন কই?”

দুঃখী বল্‌লে, “তাঁর রথের চিহ্ন পড়ে না।”

মন্ত্রী বল্‌লে, “কেন বল্‌ ত?”

দুঃখী বল্‌লে, “তিনি যে আসেন পুষ্পক রথে।”

মন্ত্রী বল্‌লে, “কই রে সেই রথ?”

দুঃখী দেখিয়ে দিলে, তার দুয়ারের দুই পাশে দুটি সূর্য্যমুখী ফুটে আছে।

সওগাত

পূজোর পরব কাছে। ভাণ্ডার নানা সামগ্রীতে ভরা। কত বেনারসী কাপড়, কত সোনার অলঙ্কার; আর ভাণ্ড ভরে' ক্ষীর দই, পাত্র ভরে' মিষ্টান্ন।

মা সওগাত পাঠাচ্ছেন।

বড় ছেলে বিদেশে রাজসরকারে কাজ করে; মেজো ছেলে সওদাগর, ঘরে থাকে না; আর কয়টি ছেলে ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া করে' পৃথক পৃথক বাড়ি করেচে; কুটুম্বরা আছে দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে।

কোলের ছেলেটি সদর দরজায় দাঁড়িয়ে সারাদিন ধরে' দেখ্চে, ভারে ভারে সওগাত চলেচে, সারে সারে দাস দাসী, থালাগুলি রঙ-বেরঙের রুমালে ঢাকা।

দিন ফুরল। সওগাত সব চলে' গেল। দিনের শেষ নৈবেদ্যের সোনার ডালি নিয়ে সূর্য্যাস্তের শেষ আভা নক্ষত্রলোকের পথে নিরুদ্দেশ হ'ল।

ছেলে ঘরে ফিরে এসে মাকে বল্লে, "মা, সবাইকে তুই সওগাত দিলি, কেবল আমাকে না।"

মা হেসে বল্‌লেন, "সবাইকে সব দেওয়া হয়ে গেছে এখন তোর জন্যে কি বাকি রইল, এই দেখ্‌!"

এই বলে' তার কপালে চুম্বন করলেন।

ছেলে কাঁদো-কাঁদো সুরে বল্‌লে, "সওগাত পাব না?"

"যখন দূরে যাবি তখন সওগাত পাবি।"

"আর যখন কাছে থাকি তখন তোর হাতের জিনিষ দিবিনে?"

মা তাকে দু-হাত বাড়িয়ে কোলে নিলেন; বল্‌লেন, "এই ত আমার হাতের জিনিষ!"

মুক্তি

১

বিরহিণী তার ফুলবাগানের একধারে বেদী সাজিয়ে তার উপর মূর্ত্তি গড়তে বস্‌ল। তার মনের মধ্যে যে মানুষটি ছিল, বাইরে তারই প্রতিরূপ প্রতিদিন একটু একটু করে' গড়ে, আর চেয়ে চেয়ে দেখে, আর ভাবে, আর চোখ দিয়ে জল পড়ে।

কিন্তু যে রূপটি একদিন তার চিত্তপটে স্পষ্ট ছিল তার উপরে ক্রমে যেন ছায়া পড়ে' আস্‌চে। রাতের বেলাকার পদ্মের মত স্মৃতির পাপ্‌ড়িগুলি অল্প অল্প করে' যেন মুদে এল্‌।

মেয়েটি তার নিজের উপর রাগ করে, লজ্জা পায়। সাধনা তার কঠিন হ'ল, ফল খায় আর জল খায়, আর তৃণশয্যায় পড়ে' থাকে।

মূর্ত্তিটি মনের ভিতর থেকে গড়তে গড়তে সে আর প্রতিমূর্ত্তি রইল না। মনে হ'ল, এ যেন কোনো

বিশেষ মানুষের ছবি নয়। যতই বেশি চেষ্টা করে ততই বেশি তফাৎ হয়ে যায়।

মূর্ত্তিকে তখন সে গয়না দিয়ে সাজাতে থাকে, একশো এক পদ্মের ডালি দিয়ে পূজো করে, সন্ধ্যে-বেলায় তার সাম্‌নে গন্ধতৈলের প্রদীপ জ্বালে,—সে প্রদীপ সোনার, সে তেলের অনেক দাম।

দিনে দিনে গয়না বেড়ে ওঠে, পূজোর সামগ্রীতেই বেদী ঢেকে যায়, মূর্ত্তিকে দেখা যায় না।

২

এক ছেলে এসে তাকে বল্‌লে, "আমরা খেল্‌ব।"

"কোথায় ?"

"ঐখানে, যেখানে তোমার পুতুল সাজিয়েচ।"

মেয়ে তাকে হাঁকিয়ে দেয়, বলে, "এখানে কোনো-দিন খেলা হবে না।"

আর এক ছেলে এসে বলে, "আমরা ফুল তুল্‌ব।"

"কোথায় ?"

"ঐযে তোমার পুতুলের ঘরের শিয়রে যে চাঁপা গাছ আছে ঐ গাছ থেকে।"

মেয়ে তাকে তাড়িয়ে দেয়, বলে, "এ ফুল কেউ ছুঁতে পাবে না।"

আর এক ছেলে এসে বলে, "প্রদীপ ধরে' আমাদের পথ দেখিয়ে দাও।"

"প্রদীপ কোথায় ?"

"ঐ যেটা তোমার পুতুলের ঘরে জ্বালো।"

মেয়ে তাকে তাড়িয়ে দেয়, বলে "ও প্রদীপ ওখান থেকে সরাতে পারব না।"

৩

এক ছেলের দল যায় আর-এক ছেলের দল আসে।

মেয়েটি শোনে তাদের কলরব, আর দেখে তাদের নৃত্য। ক্ষণকালের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে যায়। অম্‌নি চম্‌কে ওঠে, লজ্জা পায়।

মেলার দিন কাছে এল।

পাড়ার বুড়ো এসে বল্‌লে, "বাছা, মেলা দেখ্‌তে যাবিনে ?"

মেয়ে বল্‌লে, "আমি কোথাও যাব না।"

সঙ্গিনী এসে বল্‌লে, "চল্‌, মেলা দেখ্‌বি চল্‌।"

মেয়ে বল্‌লে, "আমার সময় নেই।"

ছোট ছেলেটি এসে বল্‌লে, "আমায় সঙ্গে নিয়ে মেলায় চল না।"

মেয়ে বল্‌লে, "যেতে পারব না, এইখানে যে আমার পূজো।"

৪

একদিন রাত্রে ঘুমের মধ্যেও সে যেন শুন্‌তে পেলে সমুদ্র গর্জ্জনের মত শব্দ। দলে দলে দেশ-বিদেশের লোক চলেচে, কেউবা রথে কেউবা পায়ে হেঁটে—কেউবা বোঝা পিঠে নিয়ে, কেউবা বোঝা ফেলে দিয়ে।

সকালে যখন সে জেগে উঠ্‌ল তখন যাত্রীর গানে পাখীর গান আর শোনা যায় না। ওর হঠাৎ মনে হ'ল আমাকেও যেতে হবে।

অমনি মনে পড়ে গেল, "আমার যে পূজো আছে, আমার ত যাবার জো নেই।"

তখনি ছুটে চল্‌ল তার বাগানের দিকে যেখানে মূর্ত্তি সাজিয়ে রেখেচে।

গিয়ে দেখে, মূর্ত্তি কোথায়। বেদীর উপর দিয়ে পথ হয়ে গেচে। লোকের পরে লোক চলে, বিশ্রাম নেই।

এইখানে যাকে বসিয়ে রেখেছিলেম সে কোথায়?

কে তার মনের মধ্যে বলে' উঠ্‌ল, যারা চলেচে তাদেরই মধ্যে।—

এমন সময় ছোট ছেলে এসে বল্‌লে, "আমাকে হাতে ধরে' নিয়ে চল।"

কোথায়?

ছেলে বল্‌লে, "মেলার মধ্যে তুমিও যাবে না?"

মেয়ে বল্‌লে, "হাঁ, আমিও যাব।"

যে বেদীর সাম্‌নে এসে সে বসে থাকৃত সেই বেদীর উপর হ'ল তার পথ, আর মূর্ত্তির মধ্যে যে ঢেকে গিয়েছিল সকল যাত্রীর মধ্যে তাকে পেলে।

পরীর পরিচয়

১

রাজপুত্রের বয়স কুড়ি পার হয়ে যায়, দেশ বিদেশ থেকে বিবাহের সম্বন্ধ আসে।

ঘটক বল্‌লে, "বাহ্লীক রাজের মেয়ে রূপসী বটে, যেন শাদা গোলাপের পুষ্পবৃষ্টি।"

রাজপুত্র মুখ ফিরিয়ে থাকে, জবাব করে না।

দূত এসে বল্‌লে, "গান্ধাররাজের মেয়ের অঙ্গে অঙ্গে লাবণ্য ফেটে পড়চে, যেন দ্রাক্ষালতায় আঙুরের গুচ্ছ।"

রাজপুত্র শিকারের ছলে বনে চলে যায়। দিন যায়, সপ্তাহ যায়, ফিরে আসে না।

দূত এসে বল্‌লে, "কাম্বোজের রাজকন্যাকে দেখে এলেম; ভোর বেলাকার দিগন্ত-রেখাটির মত বাঁকা চোখের পল্লব, শিশিরে স্নিগ্ধ, আলোতে উজ্জ্বল।

রাজপুত্র ভর্তৃহরির কাব্য পড়তে লাগ্‌ল, পুঁথি থেকে চোখ তুল্‌ল না।

রাজা বল্লে, "এর কারণ? ডাক দেখি মন্ত্রীর পুত্রকে।"

মন্ত্রীর পুত্র এল। রাজা বল্‌লে, "তুমি ত আমার ছেলের মিতা, সত্য করে' বল, বিবাহে তার মন নেই কেন?"

মন্ত্রীর পুত্র বল্‌লে, "মহারাজ, যখন থেকে তোমার ছেলে পরীস্থানের কাহিনী শুনেচে সেই অবধি তার কামনা সে পরী বিয়ে কর্‌বে।"

২

রাজার হুকুম হ'ল পরীস্থান কোথায় খবর চাই।

বড় বড় পণ্ডিত ডাকা হ'ল, যেখানে যত পুঁথি আছে তারা সব খুলে দেখ্‌লে। মাথা নেড়ে বল্‌লে, পুঁথির কোনো পাতায় পরীস্থানের কোনো ইসারা মেলেনা।

তখন রাজসভায় সওদাগরদের ডাক পড়ল। তারা বল্‌লে, "সমুদ্র পার হয়ে কত দ্বীপেই ঘুরলেম,—এলা দ্বীপে, মরীচ দ্বীপে, লবঙ্গলতার দেশে। আমরা গিয়েচি মলয় দ্বীপে চন্দন আন্‌তে; মৃগনাভির সন্ধানে

গিয়েচি কৈলাসে দেবদারু বনে, কোথাও পরীস্থানের কোনো ঠিকানা পাইনি।"

রাজা বল্‌লে, "ডাক মন্ত্রীর পুত্রকে।"

মন্ত্রীর পুত্র এল। রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলে, "পরীস্থানের কাহিনী রাজপুত্র কার কাছে শুনেচে?"

মন্ত্রীর পুত্র বল্লে, "সেই যে আছে নবীন পাগ্‌লা, বাঁশি হাতে বনে বনে ঘুরে বেড়ায়, শিকার করতে গিয়ে রাজপুত্র তারি কাছে পরীস্থানের গল্প শোনে।"

রাজা বল্‌লে, "আচ্ছা, ডাক তাকে।"

নবীন পাগ্‌লা এক মুঠো বনের ফুল ভেট দিয়ে রাজার সাম্‌নে দাঁড়াল। রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলে, "পরীস্থানের খবর তুমি কোথায় পেলে?"

সে বললে, "সেখানে ত আমার সদাই যাওয়া আসা।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলে, "কোথায় সে জায়গা?"

পাগ্‌লা বল্লে, "তোমার রাজ্যের সীমানায় চিত্রগিরি পাহাড়ের তলে, কাম্যক সরোবরের ধারে।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলে, "সেইখানে পরী দেখা যায়?"

পাগ্‌লা বল্‌লে, "দেখা যায়, কিন্তু চেনা যায় না। তারা ছদ্মবেশে থাকে। কখনো কখনো যখন চলে' যায় পরিচয় দিয়ে যায়, আর ধরবার পথ থাকেনা।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি তাদের চেন কি উপায়ে ?"

পাগ্‌লা বল্‌লে, "কখনো বা একটা সুর শুনে', কখনো বা একটা আলো দেখে'।"

রাজা বিরক্ত হয়ে বল্‌লে, "এর আগাগোড়া সমস্তই পাগ্‌লামি, এ'কে তাড়িয়ে দাও।"

৩

পাগ্‌লার কথা রাজপুত্রের মনে গিয়ে বাজ্‌ল।

ফাল্গুন মাসে তখন ডালে ডালে শালফুলে ঠেলাঠেলি, আর শিরীষ ফুলে বনের প্রান্ত শিউরে উঠেচে। রাজপুত্র চিত্রগিরিতে একা চলে' গেল।

সবাই জিজ্ঞাসা করলে, "কোথায় যাচ্চ ?"

সে কোনো জবাব করলে না।

গুহার ভিতর দিয়ে একটি ঝরনা ঝরে' আসে, সেটি গিয়ে মিলেচে কাম্যক সরোবরে; গ্রামের লোক তাকে বলে "উদাস ঝোরা।" সেই ঝরনাতলায় একটি পোড়ো মন্দিরে রাজপুত্র বাসা নিলে।

একমাস কেটে গেল। গাছে গাছে যে কচি পাতা উঠেছিল তাদের রঙ ঘন হয়ে আসে, আর ঝরা ফুলে বনপথ ছেয়ে যায়। এমন সময় একদিন ভোরের স্বপ্নে

রাজপুত্রের কানে একটি বাঁশির সুর এল। জেগে উঠেই রাজপুত্র বল্‌লে, "আজ পাব দেখা।"

৪

তখনি ঘোড়ায় চড়ে' ঝরনা-ধারার তীর বেয়ে চল্‌ল, পৌঁছল কাম্যক সরোবরের ধারে। দেখে, সেখানে পাহাড়েদের এক মেয়ে পদ্মবনের ধারে বসে' আছে। ঘড়ায় তার জল ভরা, কিন্তু ঘাটের থেকে সে ওঠে না। কালো মেয়ে কানের উপর কালো চুলে একটি শিরীষ ফুল পরেচে, গোধূলিতে যেন প্রথম তারা।

রাজপুত্র ঘোড়া থেকে নেমে তাকে বল্‌লে, "তোমার ঐ কানের শিরীষ ফুলটি আমাকে দেবে?"

যে হরিণী ভয় জানে না এ বুঝি সেই হরিণী? ঘাড় বেঁকিয়ে একবার সে রাজপুত্রের মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌লে। তখন তার কালো চোখের উপর একটা কিসের ছায়া আরো ঘন কালো হয়ে নেমে এল—ঘুমের উপর যেন স্বপ্ন, দিগন্তে যেন প্রথম শ্রাবণের সঞ্চার।

মেয়েটি কান থেকে ফুল খসিয়ে রাজপুত্রের হাতে দিয়ে বল্‌লে, "এই নাও।"

রাজপুত্র তাকে জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কোন্ পরী আমাকে সত্য করে' বল।"

শুনে একবার মুখে দেখা দিল বিস্ময়, তার পরেই আশ্বিন মেঘের আচম্‌কা বৃষ্টির মত তার হাসির উপর হাসি, সে আর থাম্‌তে চায় না।

রাজপুত্র মনে ভাব্‌ল, "স্বপ্ন বুঝি ফল্‌ল—এই হাসির সুর যেন সেই বাঁশির সুরের সঙ্গে মেলে।"

রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে' দুই হাত বাড়িয়ে দিলে, বল্‌লে, "এস।"

সে তার হাত ধরে' ঘোড়ায় উঠে' পড়ল, একটুও ভাব্‌ল না। তার জলভরা ঘড়া ঘাটে রইল পড়ে'।

শিরীষের ডাল থেকে কোকিল ডেকে উঠ্‌ল, কুহু কুহু কুহু কুহু।

রাজপুত্র মেয়েটিকে কানে কানে জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার নাম কি?"

সে বল্‌লে "আমার নাম কাজরী।"

উদাস ঝোরার ধারে দুজনে গেল সেই পোড়ো মন্দিরে। রাজপুত্র বল্‌লে, "এবার তোমার ছদ্মবেশ ফেলে দাও।"

সে বল্‌লে, "আমরা বনের মেয়ে, আমরা ত ছদ্মবেশ জানিনে।"

রাজপুত্র বল্‌লে, “আমি যে তোমার পরীর মূর্ত্তি দেখ্‌তে চাই।”

পরীর মূর্ত্তি! আবার সেই হাসি, হাসির উপর হাসি। রাজপুত্র ভাব্‌লে, “এর হাসির সুর এই ঝরনার সুরের সঙ্গে মেলে, এ আমার এই ঝরনার পরী।”

৫

রাজার কানে খবর গেল, রাজপুত্রের সঙ্গে পরীর বিয়ে হয়েচে। রাজবাড়ি থেকে ঘোড়া এল, হাতী এল, চতুর্দ্দোলা এল।

কাজরী জিজ্ঞাসা করলে, “এ-সব কেন?”

রাজপুত্র বল্‌লে, “তোমাকে রাজবাড়িতে যেতে হবে।”

তখন তার চোখ ছলছলিয়ে এল। মনে পড়ে' গেল, তার ঘড়া পড়ে' আছে সেই জলের ধারে, মনে পড়ে' গেল তার ঘরের আঙিনায় শুকোবার জন্যে ঘাসের বীজ মেলে দিয়ে এসেছে; মনে পড়ল তার বাপ আর ভাই শিকারে চলে' গিয়েছিল, তাদের ফেরবার সময় হয়েচে; আর মনে পড়ল তার বিয়েতে একদিন যৌতুক দেবে বলে' তার মা

গাছতলায় তাঁত পেতে কাপড় বুন্‌চে, আর গুন্ গুন্ করে' গান গাইচে।

সে বল্‌লে, "না, আমি যাব না।"

কিন্তু ঢাক ঢোল বেজে উঠ্‌ল, বাজ্‌ল বাঁশি, কাঁসি, দামামা; ওর কথা শোনা গেলনা।

চতুর্দ্দোলা থেকে কাজরী যখন রাজবাড়িতে নাম্‌ল, রাজমহিষী কপাল চাপ্‌ড়ে বল্‌লে, "এ কেমনতর পরী?"

রাজার মেয়ে বল্‌লে, "ছি, ছি, কি লজ্জা!"

মহিষীর দাসী বল্‌লে, "পরীর বেশটাই বা কি রকম?"

রাজপুত্র বল্‌লে, "চুপ কর, তোমাদের ঘরে পরী ছদ্মবেশে এসেচে।"

৬

দিনের পর দিন যায়। রাজপুত্র জ্যোৎস্নারাত্রে বিছানায় জেগে উঠে' চেয়ে দেখে কাজরীর ছদ্মবেশ একটু কোথাও খসে' পড়েচে কিনা। দেখে যে কালো মেয়ের কালো চুল এলিয়ে গেচে, আর তার দেহখানি যেন কালো পাথরে নিখুঁৎ করে' খোদা একটি প্রতিমা। রাজপুত্র চুপ করে' বসে' ভাবে,

"পরী কোথায় লুকিয়ে রইল, শেষরাতে অন্ধকারের আড়ালে উষার মত।"

রাজপুত্র ঘরের লোকের কাছে লজ্জা পেলে। একদিন মনে একটু রাগও হ'ল। কাজরী সকালবেলায় বিছানা ছেড়ে যখন উঠ্‌তে যায় রাজপুত্র শক্ত করে' তার হাত চেপে ধরে' বল্‌লে, "আজ তোমাকে ছাড়ব না,—নিজরূপ প্রকাশ কর, আমি দেখি।"

এমনি কথাই শুনে' বনে যে হাসি হেসেছিল সে হাসি আর বেরল না। দেখতে দেখ্‌তে ছুই চোখ জলে ভরে' এল।

রাজপুত্র বল্‌লে, "তুমি কি আমায় চিরদিন ফাঁকি দেবে?"

সে বল্‌লে, "না, আর নয়।"

রাজপুত্র বল্‌লে, "তবে এইবার কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় পরীকে যেন সবাই দেখে।"

৭

পূর্ণিমার চাঁদ এখন মাঝ গগনে। রাজবাড়ির নহবতে মাঝ-রাতের সুরে ঝিমি ঝিমি তান লাগে।

রাজপুত্র বরসজ্জা পরে' হাতে বরণমালা নিয়ে মহলে ঢুক্‌ল, পরী-বৌয়ের সঙ্গে আজ হবে তার শুভদৃষ্টি।

শয়নঘরে বিছানায় শাদা আস্তরণ, তার উপর শাদা কুন্দ ফুল রাশ করা ; আর উপরে জান্‌লা বেয়ে জ্যোৎস্না পড়েচে।

আর কাজরী ?

সে কোথাও নেই।

তিন প্রহরের বাঁশি বাজ্‌ল। চাঁদ পশ্চিমে হেলেচে। একে একে কুটুম্বে ঘর ভরে' গেল।

পরী কই ?

রাজপুত্র বল্‌লে, "চলে' গিয়ে পরী আপন পরিচয় দিয়ে যায়, আর তখন তা'কে পাওয়া যায় না।"

প্রাণ মন

আমার জান্‌লার সাম্‌নে রাঙামাটির রাস্তা।

ওখান দিয়ে বোঝাই নিয়ে গোরুর গাড়ি চলে, সাঁওতাল মেয়ে খড়ের আঁটি মাথায় করে' হাটে যায়, সন্ধ্যাবেলায় কলহাস্যে ঘরে ফেরে।

কিন্তু মানুষের চলাচলের পথে আজ আমার মন নেই।

জীবনের যে-ভাগটা অস্থির, নানা ভাবনায় উদ্বিগ্ন, নানা চেষ্টায় চঞ্চল সেটা আজ ঢাকা পড়ে' গেচে। শরীর আজ রুগ্ন, মন আজ নিরাসক্ত।

ঢেউয়ের সমুদ্র বাহিরতলের সমুদ্র; ভিতরতলে যেখানে পৃথিবীর গভীর গর্ভশয্যা, ঢেউ সেখানকার কথা গোলমাল করে' ভুলিয়ে দেয়। ঢেউ যখন থামে তখন সমুদ্র আপন গোচরের সঙ্গে অগোচরের, গভীরতলের সঙ্গে উপরিতলের অখণ্ড ঐক্যে স্তব্ধ হয়ে বিরাজ করে।

তেমনি আমার সচেষ্ট প্রাণ যখনি ছুটি পেল তখনি সেই গভীর প্রাণের মধ্যে স্থান পেলুম যেখানে বিশ্বের আদিকালের লীলাক্ষেত্র।

পথ-চলা পথিক যতদিন ছিলুম ততদিন পথের ধারের ঐ বট গাছটার দিকে তাকাবার সময় পাইনি; আজ পথ ছেড়ে জান্‌লায় এসেচি আজ ওর সঙ্গে মোকাবিলা স্থুরু হ'ল।

আমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে ক্ষণে ক্ষণে ও যেন অস্থির হয়ে ওঠে। যেন বল্‌তে চায়, "বুঝ্‌তে পারচ না?"

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বলি, "বুঝেচি, সব বুঝেচি; তুমি অমন ব্যাকুল হোয়ো না।"

কিছুক্ষণের জন্যে আবার শান্ত হয়ে যায়। আবার দেখি, ভারি ব্যস্ত হয়ে ওঠে; আবার সেই থর্‌থর্‌, ঝর্‌ঝর্‌, ঝল্‌মল্‌।

আবার ওকে ঠাণ্ডা করে' বলি, "হাঁ হাঁ, ঐ কথাই বটে; আমি তোমারই খেলার সাথী, লক্ষহাজার বছর ধরে' এই মাটির খেলাঘরে আমিও গণ্ডূষে গণ্ডূষে তোমারি মত সূর্য্যালোক পান করেচি, ধরণীর স্তন্যরসে আমিও তোমার অংশী ছিলেম।"

তখন ওর ভিতর দিয়ে হঠাৎ হাওয়ার শব্দ শুনি, ও বল্‌তে থাকে হাঁ, হাঁ, হাঁ।

যে-ভাষা রক্তের মর্ম্মরে আমার হৃৎপিণ্ডে বাজে, যা আলো-অন্ধকারের নিঃশব্দ আবর্ত্তন-ধ্বনি, সেই ভাষা ওর পত্রমর্ম্মরে আমার কাছে এসে পৌঁছয়। সেই ভাষা বিশ্বজগতের সরকারী ভাষা।

তার মূল বাণীটি হচ্চে, "আছি, আছি; আমি আছি, আমরা আছি।"

সে ভারি খুসির কথা। সেই খুসিতে বিশ্বের অণুপরমাণু থর্‌থর্‌ করে' কাঁপ্‌চে।

ঐ বটগাছের সঙ্গে আমার আজ সেই এক-ভাষায় সেই এক-খুসির কথা চলেচে।

ও আমাকে বল্‌চে, "আছ হে বটে?"

আমি সাড়া দিয়ে বল্‌চি, "আছি হে মিতা!"

এমনি করে' "আছি"তে "আছি"তে একতালে করতালি বাজ্‌চে।

২

ঐ বটগাছটার সঙ্গে যখন আমার আলাপ সুরু হ'ল তখন বসন্তে ওর পাতাগুলো কচি ছিল; তার নানা ফাঁক দিয়ে আকাশের পলাতক আলো ঘাসের উপর এসে পৃথিবীর ছায়ার সঙ্গে গোপনে গলাগলি করত।

তারপরে আষাঢ়ের বর্ষা নাম্‌ল; ওরও পাতার রং মেঘের মত গম্ভীর হয়ে এসেচে। আজ সেই পাতার রাশ প্রবীণের পাকা বুদ্ধির মত নিবিড়, তার কোনো ফাঁক দিয়ে বাইরের আলো প্রবেশ করবার পথ পায় না। তখন গাছটি ছিল গরীবের মেয়েটির মত; আজ সে ধনীঘরের গৃহিণী; যেন পর্য্যাপ্ত পরিতৃপ্তির চেহারা।

আজ সকালে সে তার মরকত-মণির বিশনলী হার ঝলমলিয়ে আমাকে বল্‌লে, "মাথার উপর অমনতর ইঁটপাথর মুড়ি দিয়ে বসে আছ কেন? আমার মত একেবারে ভরপূর বাইরে এস না!"

আমি বল্‌লেম, "মানুষকে যে ভিতর বাহির দুই বাঁচিয়ে চল্‌তে হয়।"

গাছ নড়েচড়ে বলে উঠ্‌ল, "বুঝ্‌তে পারলেম না।"

আমি বল্‌লেম, "আমাদের দুটো জগৎ, ভিতরের আর বাইরের।"

গাছ বল্‌লে, "সর্ব্বনাশ! ভিতরেরটা আছে কোথায়?"

—"আমার আপনারই ঘেরের মধ্যে।"

—"সেখানে কর কি?"

—"সৃষ্টি করি।"

—"সৃষ্টি আবার ঘেরের মধ্যে! তোমার কথা বোঝ্‌বার জো নেই।"

আমি বল্‌লেম, "যেমন তীরের মধ্যে বাঁধা পড়ে' হয় নদী, তেম্‌নি ঘেরের মধ্যে ধরা পড়েই ত সৃষ্টি। একই জিনিষ ঘেরের মধ্যে আট্‌কা পড়ে' কোথাও হীরের টুক্‌রো, কোথাও বটের গাছ।"

গাছ বল্‌লে, "তোমার ঘেরটা কি রকম শুনি!"

আমি বল্‌লেম, "সেইটি আমার মন। তার মধ্যে যা ধরা পড়চে তাই নানা সৃষ্টি হয়ে উঠ্‌চে।"

গাছ বল্‌লে, "তোমার সেই বেড়া-ঘেরা সৃষ্টিটা আমাদের চন্দ্র-সূর্য্যের পাশে কতটুকুই বা দেখায়?

আমি বল্‌লেম, "চন্দ্র-সূর্য্যকে দিয়ে তাকে ত মাপা যায় না, চন্দ্র-সূর্য্য যে বাইরের জিনিষ।"

—"তাহ'লে মাপ্‌বে কি দিয়ে?"

—"সুখ দিয়ে—বিশেষত দুঃখ দিয়ে।"

গাছ বল্‌লে, "এই পূবে হাওয়া আমার কানে কানে কথা কয়, আমার প্রাণে প্রাণে তার সাড়া জাগে। কিন্তু তুমি যে কিসের কথা বল্‌লে আমি কিছুই বুঝ্‌লেম না।"

আমি বল্‌লেম, "বোঝাই কি করে'? তোমার ঐ পূবে হাওয়াকে আমাদের বেড়ার মধ্যে ধরে' বীণার তারে যেম্‌নি বেঁধে ফেলেচি অম্‌নি সেই হাওয়া এক

সৃষ্টি থেকে একেবারে আরেক সৃষ্টিতে এসে পৌঁছয়। এই সৃষ্টি কোন্ আকাশে যে স্থান পায়, কোন্ বিরাট চিত্তের স্মরণাকাশে, তা আমিও ঠিক জানি নে। মনে হয় যেন বেদনার একটা আকাশ আছে। সে আকাশ মাপের আকাশ নয়।"

—"আর ওর কাল?"

—"ওর কালও ঘটনার কাল নয়, বেদনার কাল। তাই সে কাল সংখ্যার অতীত।"

—"দুই আকাশ দুই কালের জীব তুমি, তুমি অদ্ভুত। তোমার ভিতরের কথা কিচ্ছুই বুঝ্‌লেম না।"

—"নাই বা বুঝ্‌লে।"

—"আমার বাইরের কথা তুমিই কি ঠিক বোঝ?"

—"তোমার বাইরের কথা আমার ভিতরে এসে যে কথা হয়ে ওঠে তাকে যদি বোঝা বল ত সে বোঝা, যদি গান বল ত গান, কল্পনা বল ত কল্পনা।"

৬

গাছ তার সমস্ত ডালগুলো তুলে আমাকে বল্‌লে, "একটু থামো। তুমি বড় বেশি ভাবো, আর বড় বেশি বকো।"

শুনে আমার মনে হ'ল, "একথা সত্যি।" আমি

বল্‌লেম, "চুপ করবার জন্যেই তোমার কাছে আসি, কিন্তু অভ্যাস দোষে চুপ করে করেও বকি ; কেউ কেউ যেমন ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও চলে।"

কাগজটা পেন্সিলটা টেনে ফেলে দিলেম, রইলেম ওর দিকে অনিমেষ তাকিয়ে। ওর চিকন পাতাগুলো ওস্তাদের আঙুলের মত আলোকবীণায় দ্রুততালে ঘা দিতে লাগ্‌ল।

হঠাৎ আমার মন বলে উঠ্‌ল, "এই তুমি যা দেখ্‌চ আর এই আমি যা ভাব্‌চি এর মাঝখানের যোগটা কোথায় ?

আমি তাকে ধমক দিয়ে বল্‌লেম, "আবার তোমার প্রশ্ন ? চুপ কর।"

চুপ করে রইলেম, একদৃষ্টে চেয়ে দেখ্‌লেম। বেলা কেটে গেল।

গাছ বল্‌লে, "কেমন, সব বুঝেচ ?"

আমি বল্‌লেম, "বুঝেচি।"

৪

সেদিন ত চুপ করেই কাট্‌ল।

পরদিনে আমার মন আমাকে জিজ্ঞাসা করলে "কাল গাছটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হঠাৎ বলে' উঠ্‌লে 'বুঝেচি', কি বুঝেচ বল ত ?"

আমি বল্‌লেম, "নিজের মধ্যে মানুষের প্রাণটা নানা ভাবনায় ঘোলা হয়ে গেচে। তাই প্রাণের বিশুদ্ধ রূপটি দেখতে হ'লে চাইতে হয় ঐ ঘাসের দিকে ঐ গাছের দিকে।"

—"কি রকম দেখ্‌লে ?"

—"দেখ্‌লেম, এই প্রাণের আপনাতে আপনার কি আনন্দ! নিজেকে নিয়ে পাতায় পাতায়, ফুলে ফুলে, ফলে ফলে, কত যত্নে সে কত ছাঁটই ছেঁটেচে, কত রঙই লাগিয়েচে, কত গন্ধ, কত রস! তাই ঐ বটের দিকে তাকিয়ে নীরবে বল্‌ছিলেম, 'ওগো বনস্পতি, জন্মমাত্রই পৃথিবীতে প্রথম প্রাণ যে-আনন্দধ্বনি করে' উঠেছিল সেই ধ্বনি তোমার শাখায় শাখায়। সেই আদি যুগের সরল হাসিটি তোমার পাতায় পাতায় ঝল্‌মল্‌ করচে। আমার মধ্যে সেই প্রথম প্রাণ আজ চঞ্চল হ'ল। ভাবনার বেড়ার মধ্যে সে বন্দী হয়ে বসে ছিল, তুমি তাকে ডাক দিয়ে বলেচ, ওরে আয় না রে আলোর মধ্যে, হাওয়ার মধ্যে; আর আমারি মত নিয়ে আয় তোর রূপের তুলি, রঙের বাটি, রসের পেয়ালা!"

মন আমার খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপরে কিছু বিমর্ষ হয়ে বল্‌লে, "তুমি ঐ প্রাণের কথাটাই নিয়ে কিছু বাড়াবাড়ি করে' থাক, আমি যেসব উপকরণ

জড় করচি তার কথা এমন সাজিয়ে সাজিয়ে বলনা কেন ?”

—“তার কথা আর কইব কি ! সে নিজেই নিজের টঙ্কারে ঝঙ্কারে হুঙ্কারে ক্রেঙ্কারে আকাশ কাঁপিয়ে রেখেচে। তার ভারে, তার জটিলতায়, তার জঞ্জালে পৃথিবীর বক্ষ ব্যথিত হয়ে উঠ্‌ল। ভেবে পাইনে এর অন্ত কোথায়। থাকের উপরে আর কত থাক উঠ্‌বে, গাঁঠের উপরে আর কত গাঁঠ পড়বে ? এই প্রশ্নেরই জবাব ছিল ঐ গাছের পাতায়।”

—“বটে ? কি জবাব, শুনি।”

—“সে বল্‌চে, প্রাণ যতক্ষণ নেই ততক্ষণ সমস্তই কেবল স্তূপ, সমস্তই কেবল ভার। প্রাণের পরশ লাগ্‌বামাত্রই উপকরণের সঙ্গে উপকরণ আপ্‌নি মিলে গিয়ে অখণ্ড সুন্দর হয়ে ওঠে। সেই সুন্দরকেই দেখ এই বনবিহারী। তারি বাঁশি ত বাজ্‌চে বটের ছায়ায়।”

৫

তখন কবেকার কোন্‌ ভোর রাত্রি।

প্রাণ আপন সুপ্তিশয্যা ছাড়ল ; সেই প্রথম পথে বাহির হ’ল অজানার উদ্দেশে, অসাড় জগতের তেপান্তর মাঠে।

তখনো তার দেহে ক্লান্তি নেই, মনে চিন্তা নেই ; তার রাজপুত্তুরের সাজে না লেগেচে ধূলো, না ধরেচে ছিদ্র।

সেই অক্লান্ত নিশ্চিন্ত অম্লান প্রাণটিকে দেখ্‌লেম এই আষাঢ়ের সকালে, ঐ বট গাছটিতে। সে তার শাখা নেড়ে আমাকে বল্‌লে, "নমস্কার!"

আমি বল্‌লেম, "রাজপুত্তুর, মরুদৈত্যটার সঙ্গে লড়াই চল্‌চে কেমন বল ত?"

সে বল্‌লে, "বেশ চল্‌চে, একবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখ না।"

তাকিয়ে দেখি, উত্তরের মাঠ ঘাসে ঢাকা, পূবের মাঠে আউশ ধানের অঙ্কুর, দক্ষিণে বাঁধের ধারে তালের শার ; পশ্চিমে শালে তালে মহুয়ায়, আমে জামে খেজুরে, এম্‌নি জটলা করেচে যে দিগন্ত দেখা যায় না।

আমি বল্‌লেম, "রাজপুত্তুর, ধন্য তুমি! তুমি কোমল তুমি কিশোর, আর দৈত্যটা হল যেমন প্রবীণ তেমনি কঠোর ; তুমি ছোট, তোমার তূণ ছোট, তোমার তীর ছোট, আর ও হ'ল বিপুল, ওর বর্ম্ম মোটা, ওর গদা মস্ত। তবু ত দেখি দিকে দিকে তোমার ধ্বজা উড়ল ; দৈত্যটার পিঠের উপর তুমি পা রেখেচ, পাথর মান্‌চে হার, ধূলো দাসখৎ লিখে দিচ্চে।"

বট বল্‌লে, "তুমি এত সমারোহ কোথায় দেখ্‌লে ?"

আমি বল্‌লেম, "তোমার লড়াইকে দেখি শান্তির রূপে, তোমার কর্ম্মকে দেখি বিশ্রামের বেশে, তোমার জয়কে দেখি নম্রতার মূর্ত্তিতে। সেই জন্যেই ত তোমার ছায়ায় সাধক এসে বসেচে ঐ সহজ যুদ্ধ-জয়ের মন্ত্র আর ঐ সহজ অধিকারের সন্ধিটি শেখ্‌বার জন্যে। প্রাণ যে কেমন করে' কাজ করে, অরণ্যে অরণ্যে তারি পাঠশালা খুলেচ। তাই যারা ক্লান্ত তারা তোমার ছায়ায় আসে, যারা আর্ত্ত তারা তোমার বাণী খোঁজে।"

আমার স্তব শুনে বটের ভিতরকার প্রাণপুরুষ বুঝি খুসি হ'ল, সে বলে' উঠ্‌ল, "আমি বেরিয়েচি মরুদৈত্যের সঙ্গে লড়াই করতে, কিন্তু আমার এক ছোট ভাই আছে, সে যে কোন্ লড়াইয়ে কোথায় চলে' গেল আমি তার আর নাগাল পাইনে। কিছুক্ষণ আগে তারই কথা কি তুমি বল্‌ছিলে ?"

"হ্যাঁ, তাকেই আমরা নাম দিয়েচি, মন।"

"সে আমার চেয়ে চঞ্চল। কিছুতে তার সন্তোষ নেই। সেই অশান্তটার খবর আমাকে দিতে পার ?"

আমি বল্‌লেম, "কিছু কিছু পারি বই কি। তুমি লড়চ বাঁচবার জন্যে, সে লড়চে পাবার জন্যে, আরো

দূরে আর একটা লড়াই চল্‌চে ছাড়বার জন্যে। তোমার লড়াই অসাড়ের সঙ্গে, তার লড়াই অভাবের সঙ্গে, আরো একটা লড়াই আছে সঞ্চয়ের সঙ্গে। লড়াই জটিল হয়ে উঠ্‌ল, ব্যূহের মধ্যে যে প্রবেশ করচে ব্যূহ থেকে বেরবার পথ সে খুঁজে পাচ্চে না। হার জিৎ অনিশ্চিত বলে' ধাঁদা লাগ্‌ল। এই দ্বিধার মধ্যে তোমার ঐ সবুজ পতাকা যোদ্ধাদের আশ্বাস দিচ্চে। বল্‌চে, "জয়, প্রাণের জয়!" গানের তান বেড়ে বেড়ে চলেচে, কোন্ সপ্তক থেকে কোন্ সপ্তকে চড়ল তার ঠিকানা নেই। এই স্বর-সঙ্কটের মধ্যে তোমার তম্বুরাটি সরল তারে বল্‌চে, "ভয় নেই, ভয় নেই।" বল্‌চে, "এই ত মূল সুর আমি বেঁধে রেখেচি, এই আদি প্রাণের সুর। সকল উন্মত্ত তানই এই সুরে সুন্দরের ধুয়োয় এসে মিল্‌বে, আনন্দের গানে। সকল পাওয়া সকল দেওয়া ফুলের মত ফুট্‌বে, ফলের মত ফল্‌বে।"

আগমনী

১

আয়োজন চলেইচে। তার মাঝে একটুও ফাঁক পাওয়া যায় না যে, ভেবে দেখি, কিসের আয়োজন।

তবুও কাজের ভিড়ের মধ্যে মনকে এক-একবার ঠেলা দিয়ে জিজ্ঞাসা করি, "কেউ আস্‌বে বুঝি ?"

মন বলে, "রোসো! আমাকে জায়গা দখল কর্‌তে হবে, জিনিষপত্র জোগাতে হবে, ঘর-বাড়ী গড়্‌তে হবে, এখন আমাকে বাজে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোরো না!"

চুপচাপ করে' আবার খাট্‌তে বসি। ভাবি, জায়গা দখল সারা হবে, জিনিষপত্র-সংগ্রহ শেষ হবে, ঘরবাড়ী গড়া বাকী থাক্‌বে না, তখন শেষ জবাব মিল্‌বে।

জায়গা বেড়ে চলেচে, জিনিষপত্র কম হ'ল না, ইমারতের সাতটা মহল সারা হ'ল। আমি বল্‌লেম, "এইবার আমার কথার একটা জবাব দাও!"

মন বলে, "আরে রোসো, আমার সময় নেই!"

আমি বল্‌লেম, "কেন, আরো জায়গা চাই? আরো ঘর, আরো সরঞ্জাম?"

মন বল্‌লে, "চাই বই কি!"

আমি বল্‌লেম, "এখনো যথেষ্ট হয়'ন?"

মন বল্‌লে, "এতটুকুতে ধর্‌বে কেন?"

আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লেম, "কি ধর্‌বে? কাকে ধর্‌বে?"

মন বল্‌লে, "সে-সব কথা পরে হবে।"

তবু আমি প্রশ্ন কর্‌লেম, "সে বুঝি মস্ত বড়?"

মন উত্তর কর্‌লে, "বড় বই কি!"

এত বড় ঘরেও তাকে কুলবে না, এত মস্ত জায়গায়! আবার উঠে পড়ে লাগ্‌লেম। দিনে আহার নেই, রাত্রে নিদ্রা নেই। যে দেখ্‌লে, সেই বাহবা দিলে, বল্‌লে, "কাজের লোক বটে!"

এক একবার কেমন আমার সন্দেহ হ'তে লাগ্‌ল, বুঝি মন বাঁদরটা আসল কথার জবাব জানে না! সেই জন্যেই কেবল কাজ চাপা দিয়ে জবাবটাকে সে ঢাকা দেয়। মাঝে মাঝে এক-একবার ইচ্ছা হয়,

কাজ বন্ধ করে' কান পেতে শুনি, পথ দিয়ে কেউ আস্‌চে কি না। ইচ্ছা হয়, আর ঘর না বাড়িয়ে ঘরে আলো জ্বালি, আর সাজ-সরঞ্জাম না জুটিয়ে ফুল্‌-ফোটার বেলা থাক্‌তে একটা মালা গেঁথে রাখি।

কিন্তু ভরসা হয় না। কারণ, আমার প্রধান মন্ত্রী হ'ল মন। সে দিন-রাত তার দাঁড়িপাল্লা আর মাপকাঠি নিয়ে ওজনদরে আর গজের মাপে সমস্ত জিনিষ যাচাই কর্‌চে। সে কেবলি বল্‌চে, "আরো না হ'লে চল্‌বে না।"

"কেন চল্‌বে না?"

"সে যে মস্ত বড়।"

"কে মস্ত বড়?"

বাস্, চুপ। আর কথা নেই।

যখন তাকে চেপে ধরি, "অমন করে' এড়িয়ে গেলে চল্‌বে না, একটা জবাব দিতেই হবে।" তখন সে রেগে উঠে বলে, "জবাব দিতেই হবে, এমন কি কথা? যার উদ্দেশ মেলে না, যার খবর পাইনে, যার মানে বোঝ্‌বার জো নেই, তুমি সেই কথা নিয়েই কেবল আমার কাজ কামাই করে' দাও। আর আমার এই দিক্‌টাতে তাকাও দেখি! কত মাম্‌লা, কত লড়াই; লাঠি সড়কি পাইক বরকন্দাজে পাড়া জুড়ে গেল; মিস্ত্রীতে

মজুরে, ইঁট কাঠ চুন সুরকিতে কোথাও পা ফেল্‌বার জো কি! সমস্তই স্পষ্ট, এর মধ্যে আন্দাজ নেই, ইসারা নেই। তবে এ-সমস্ত পেরিয়েও আবার প্রশ্ন কেন?"

শুনে তখন ভাবি, "মনটাই সেয়ানা, আমিই অবুঝ।" আবার ঝুড়িতে করে' ইঁট বয়ে আনি, চূনের সঙ্গে সুর্‌কি মেশাতে থাকি।

২

এমনি করেই দিন যায়। আমার ভূমি দিগন্ত পেরিয়ে গেল, ইমারতে পাঁচতলা সারা হয়ে ছ'তলার ছাদ পিটোনো চল্‌চে। এমন সময়ে একদিন বাদলের মেঘ কেটে গেল; কালো মেঘ হ'ল সাদা; কৈলাসের শিখর থেকে ভৈরোঁর তান নিয়ে ছুটির হাওয়া বইল, মানসসরোবরে পদ্মগন্ধে দিনরাত্রির দণ্ডপ্রহরগুলোকে মৌমাছির মত উতলা করে' দিলে। উপরের দিকে তাকিয়ে দেখি, সমস্ত আকাশ হেসে উঠেচে, আমার ছয়তলা ঐ বাড়িটার উদ্ধত ভারাগুলোর দিকে চেয়ে।

আমি ত ব্যাকুল হয়ে পড়্‌লেম; যাকে দেখি, তাকেই জিজ্ঞাসা করি, "ওগো, কোন্‌ হাওয়াখানা থেকে আজ নহবৎ বাজ্‌চে বল ত?"

তারা বলে, "ছাড়, আমার কাজ আছে।"

একটা ক্ষ্যাপা পথের ধারে গাছের গুঁড়িতে হেলান্ দিয়ে মাথায় কুন্দফুলের মালা জড়িয়ে চুপ করে' বসে ছিল। সে বল্‌লে, "আগমনীর সুর এসে পৌঁছল।"

আমি যে কি বুঝ্‌লেম, জানিনে, বলে' উঠ্‌লেম, "তবে আর দেরী নেই।"

সে হেসে বল্লে, "না, এল বলে'!"

তখনি খাতাঞ্জিখানায় এসে মনকে বল্‌লেম, "এবার কাজ বন্ধ কর।"

মন বল্‌লে, "সে কি কথা! লোকে যে বল্‌বে অকর্ম্মণ্য।"

আমি বল্‌লেম, "বলুকগে!"

মন বল্‌লে, "তোমার হ'ল কি! কিছু খবর পেয়েচ নাকি!"

আমি বল্‌লেম, "হাঁ, খবর এসেচে।"

"কি খবর?"

মুস্কিল, স্পষ্ট করে' জবাব দিতে পারিনে। কিন্তু খবর এসেচে। মানসসরোবরের তীর থেকে আলোকের পথ বেয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে হাঁস এসে পৌঁছল।

মন মাথা নেড়ে বল্‌লে, "মস্ত বড় রথের চূড়ো

কোথায়, আর মস্ত ভারী সমারোহ ? কিছু ত দেখিনে, শুনিনে।”

বল্‌তে বল্‌তে আকাশে কে যেন পরশমণি ছুঁইয়ে দিলে। সোনার আলোয় চারদিক্ ঝল্‌মল্ করে’ উঠ্‌ল। কোথা থেকে একটা রব উঠে গেল,—“দূত এসেচে।”

আমি মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে দূতের উদ্দেশে জিজ্ঞাসা করলেম, “আস্‌চেন নাকি ?”

চারিদিক্ থেকে জবাব এল—“হাঁ, আস্‌চেন।”

মন ব্যস্ত হয়ে বলে’ উঠ্‌ল, “কি করি! সবেমাত্র আমার ছয়তলা বাড়ির ছাদ পিটোনো চল্‌চে; আর সাজসরঞ্জাম সব ত এসে পৌঁছল না।”

উত্তর শোনা গেল, “আরে, ভাঙো, ভাঙো তোমার ছ’তলা বাড়ি ভাঙো!”

মন বল্‌লে, “কেন ?”

উত্তর এল, “আজ আগমনী যে! তোমার ইমারৎটা বুক ফুলিয়ে পথ আট্‌কেচে।”

মন অবাক্ হয়ে রইল।

আবার শুনি, “ঝেঁটিয়ে ফেল তোমার সাজসরঞ্জাম।”

মন বল্‌লে, “কেন ?”

“তোমার সরঞ্জাম যে ভিড় করে’ জায়গা জুড়েচে।”

যাক্ গে। কাজের দিনে বসে' বসে' ছ'তলা বাড়ি গাঁথ্‌লেম, ছুটির দিনে একে একে সব ক'টা তলা ধূলিসাৎ কর্‌তে হ'ল। কাজের দিনে সাজ-সরঞ্জাম হাটে হাটে জড়ো করা গেল, ছুটির দিনে সমস্ত বিদায় করেচি।

কিন্তু মস্ত বড় রথের চূড়ো কোথায়, আর মস্ত ভারী সমারোহ ?

মন চারদিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে।

কি দেখ্‌তে পেলে ?

শরৎপ্রভাতের শুকতারা।

কেবল ঐটুকু ?

হাঁ, ঐটুকু। আর দেখ্‌তে পেলে শিউলিবনের শিউলি ফুল।

কেবল ঐটুকু ?

হাঁ, ঐটুকু। আর দেখা দিল ল্যাজ ছুলিয়ে ভোরবেলাকার একটি দোয়েল পাখী।

আর কি ?

আর একটি শিশু, সে খিল্‌খিল্ করে' হাস্‌তে হাস্‌তে মায়ের কোল থেকে ছুটে পালিয়ে এল বাইরের আলোতে।

তুমি যে বল্‌লে আগমনী, সে কি এরই জন্যে ?

হাঁ, এরি জন্যেই ত প্রতিদিন আকাশে বাঁশী বাজে, ভোরের বেলায় আলো হয়।

এরি জন্যে এত জায়গা চাই ?

হাঁগো, তোমার রাজার জন্যে সাতমহলা বাড়ি, তোমার প্রভুর জন্যে ঘরভরা সরঞ্জাম। আর এদের জন্যে সমস্ত আকাশ, সমস্ত পৃথিবী।

আর মস্ত বড় ?

মস্ত বড় এইটুকুর মধ্যেই থাকেন।

ঐ শিশু তোমাকে কি বর দেবে ?

ঐ ত বিধাতার বর নিয়ে আসে। সমস্ত পৃথিবীর আশা নিয়ে, অভয় নিয়ে, আনন্দ নিয়ে। ওরি গোপন তূণে লুকোনো থাকে ব্রহ্মাস্ত্র, ওরি হৃদয়ের মধ্যে ঢাকা আছে শক্তিশেল।

মন আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, "হাঁ গো কবি, কিছু দেখ্‌তে পেলে, কিছু বুঝ্‌তে পার্‌লে ?"

আমি বল্‌লেম, "সেই জন্যেই ছুটি নিয়েচি। এত দিন সময় ছিল না, তাই দেখ্‌তে পাইনি, বুঝ্‌তে পারিনি।"

স্বর্গ-মর্ত্ত্য

গান

মাটির প্রদীপখানি আছে মাটির ঘরের কোলে,
সন্ধ্যাতারা তাকায় তারি আলো দেখ্‌বে বলে' ॥
সেই আলোটি নিমেষ-হত প্রিয়ার ব্যাকুল চাওয়ার মত,
সেই আলোটি মায়ের প্রাণের ভয়ের মত দোলে ॥
সেই আলোটি নেবে জ্বলে শ্যামল ধরার হৃদয়তলে,
সেই আলোটি চপল হাওয়ায় ব্যথায় কাঁপে পলে পলে।
নাম্‌ল সন্ধ্যাতারার বাণী আকাশ হ'তে আশীষ আনি',
অমর শিখা আকুল হ'ল মর্ত্ত্য শিখায় উঠ্‌তে জ্বলে' ॥

ইন্দ্র। সুরগুরো, একদিন দৈত্যদের হাতে আমরা স্বর্গ হারিয়েছিলুম। তখন দেবে মানবে মিলে আমরা স্বর্গের জন্যে লড়াই করেচি এবং স্বর্গকে উদ্ধার করেচি কিন্তু এখন আমাদের বিপদ তার চেয়ে অনেক বেশি। সে-কথা চিন্তা করে' দেখ্‌বেন।

বৃহস্পতি। মহেন্দ্র, আপনার কথা আমি ঠিক বুঝ্‌তে পারচিনে। স্বর্গের কি বিপদ আশঙ্কা করচেন ?

ইন্দ্র। স্বর্গ নেই।

বৃহস্পতি। নেই ? সে কি কথা ? তাহ'লে আমরা আছি কোথায় ?

ইন্দ্র। আমরা আমাদের অভ্যাসের উপর আছি, স্বর্গ যে কখন্ ক্রমে ক্ষীণ হয়ে ছায়া হয়ে লুপ্ত হয়ে গেছে, তা জান্‌তেও পারিনি।

কার্ত্তিকেয়। কেন দেবরাজ, স্বর্গের সমস্ত সমারোহে সমস্ত অনুষ্ঠানই ত চল্‌চে।

ইন্দ্র। অনুষ্ঠান ও সমারোহ বেড়ে উঠেচে, দিন-শেষে সূর্য্যাস্তের সমারোহের মত, তার পশ্চাতে অন্ধকার। তুমি ত জান দেব-সেনাপতি, স্বর্গ এত মিথ্যা হয়েচে যে, সকল প্রকার বিপদের ভয় পর্য্যন্ত তার চলে' গেছে। দৈত্যেরা যে কত যুগ-যুগান্তর তাকে আক্রমণ করে নি তা মনে পড়ে না। আক্রমণ করবার যে কিছুই নেই। মাঝে মাঝে স্বর্গের যখন পরাভব হ'ত তখনও স্বর্গ ছিল, কিন্তু যখন থেকে—

কার্ত্তিকেয়। আপনার কথা যেন কিছু কিছু বুঝ্‌তে পারচি।

বৃহস্পতি। স্বপ্ন থেকে জাগ্‌বামাত্রই যেমন বোঝা যায় স্বপ্ন দেখ্‌ছিলুম, ইন্দ্রের কথা শুনেই তেমনি মনে

হচ্চে একটা যেন মায়ার মধ্যে ছিলুম কিন্তু তবু এখনো সম্পূর্ণ ঘোর ভাঙেনি।

কার্ত্তিকেয়। আমার কি-রকম বোধ হচ্চে বল্‌ব? তূণের মধ্যে শর আছে, সেই শরের ভার বহন করচি, সেই শরের দিকেই মন বদ্ধ আছে, ভাব্‌চি সমস্তই ঠিক আছে। এমন সময়ে কে যেন বল্লে, একবার তোমার চারিদিকে তাকিয়ে দেখ। চেয়ে দেখি শর আছে কিন্তু লক্ষ্য করবার কিছুই নেই। স্বর্গের লক্ষ্য চলে' গেছে।

বৃহস্পতি। কেন এমন্ হ'ল তার কারণ ত জানা চাই।

ইন্দ্র। যে মাটির থেকে রস টেনে স্বর্গ আপনার ফুল ফুটিয়েছিল, সেই মাটির সঙ্গে তার সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে গেছে।

বৃহস্পতি। মাটি আপনি কাকে বল্‌চেন?

ইন্দ্র। পৃথিবীকে। মনে ত আছে একদিন মানুষ স্বর্গে এসে দেবতার কাজে যোগ দিয়েচে এবং দেবতা পৃথিবীতে নেমে মানুষের যুদ্ধে অস্ত্র ধরেচে। তখন স্বর্গ মর্ত্ত্য উভয়েই সত্য হয়ে উঠেছিল তাই সেই যুগকে সত্যযুগ বলৃত। সেই পৃথিবীর সঙ্গে যোগ না থাক্‌লে স্বর্গ আপনার অমৃতে আপনি কি বাঁচ্‌তে পারে?

কার্ত্তিকেয়। আর পৃথিবীও যে যায়, দেবরাজ। মানুষ এম্‌নি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যাচ্চে, যে, সে

আপনার শৌর্য্যকে আর বিশ্বাস করে না কেবল বস্তুর উপরেই তার ভরসা। বস্তু নিয়ে মারামারি কাটাকাটি পড়ে গেছে। স্বর্গের টান যে ছিন্ন হয়েচে তাই আত্মা বস্তু ভেদ করে' আলোকের দিকে উঠ্‌তে পারচে না।

বৃহস্পতি। এখন উদ্ধারের উপায় কি ?

ইন্দ্র। পৃথিবীর সঙ্গে স্বর্গের আবার যোগ সাধন করতে হবে।

বৃহস্পতি। কিন্তু দেবতারা যে-পথ দিয়ে পৃথিবীতে যেতেন, অনেক দিন হ'ল সে পথের চিহ্ন লোপ হয়ে গেছে। আমি মনে করেছিলুম, ভালোই হয়েচে; ভেবেছিলুম এইবার প্রমাণ হয়ে যাবে স্বর্গ নিরপেক্ষ, নিরবলম্ব, আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ।

ইন্দ্র। একদিন সকলেরই সেই বিশ্বাস ছিল কিন্তু এখন বোঝা যাচ্চে পৃথিবীর প্রেমেই স্বর্গ বাঁচে নইলে স্বর্গ শুকিয়ে যায়। অমৃতের অভিমানে সেই কথা ভুলেছিলুম বলেই পৃথিবীতে দেবতার যাবার পথচিহ্ন লোপ পেয়েছিল।

কার্ত্তিকেয়। দৈত্যদের পরাভবের পর থেকে আমরা আটঘাট বেঁধে স্বর্গকে সুরক্ষিত করে' তুলেছি। তার পর থেকে স্বর্গের ঐশ্বর্য্য স্বর্গের মধ্যেই জমে' আস্‌চে, বাহিরে তার আর প্রয়োগ নেই, তার আর

ক্ষয় নেই। যুগ যুগ হ'তে অব্যাঘাতে তার এতই উন্নতি হয়ে এসেচে যে, বাহিরের অন্য সমস্ত কিছু থেকে স্বর্গ বহুদূরে চলে' গেছে। স্বর্গ তাই আজ একলা।

ইন্দ্র। উন্নতিই হোক্ আর দুর্গতিই হোক্ যাতেই চারদিকের সঙ্গে বিচ্ছেদ আনে, তাতেই ব্যর্থতা আনে। ক্ষুদ্র থেকে মহৎ যখন সুদূরে চলে' যায়, তখন তার মহত্ত্ব নিরর্থক হয়ে আপনাকে আপনি ভারগ্রস্ত করে মাত্র। স্বর্গের আলো আজ আপনার মাটির প্রদীপের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলেয়ার আলো হয়ে উঠেচে— লোকালয়ের আয়ত্তের অতীত হয়ে সে নিজেরও আয়ত্তের অতীত হয়েছে, নির্ব্বাপনের শাস্তির চেয়ে তার এই শাস্তি গুরুতর। দেবলোক আপনাকে অতি বিশুদ্ধ রাখ্‌তে গিয়ে আপন শুচিতার উচ্চ প্রাচীরে নিজেকে বন্দী করেচে—সেই দুর্গম প্রাচীর ভেঙে গঙ্গার ধারার মত মলিন মর্ত্তের মধ্যে তাকে প্রবাহিত করে' দিয়ে তবে তার বন্ধন মোচন হবে। তার সেই স্বাতন্ত্র্যের বেষ্টন বিদীর্ণ করবার জন্যেই আমার মন আজ এমন বিচলিত হয়ে উঠেচে। স্বর্গকে আমি ঘিরতে দেব না, বৃহস্পতি, মলিনের সঙ্গে পতিতের সঙ্গে, অজ্ঞানীর সঙ্গে, দুঃখীর সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দিতে হবে।

বৃহস্পতি। তাহ'লে আপনি কি করতে চান?

ইন্দ্র। আমি পৃথিবীতে যাব।

বৃহস্পতি। সেই যাবার পথটাই বন্ধ, সেই নিয়েই ত দুঃখ।

ইন্দ্র। দেবতার স্বরূপে সেখানে আর যেতে পারব না, মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করব। নক্ষত্র যেমন খসে' পড়ে' তার আকাশের আলো আকাশে নিবিয়ে দিয়ে মাটি হয়ে মাটিকে আলিঙ্গন করে; আমি তেমনি করে' পৃথিবীতে যাব।

বৃহস্পতি। আপনার জন্মাবার উপযুক্ত বংশ পৃথিবীতে এখন কোথায়?

কার্ত্তিকেয়। বৈশ্য এখন রাজা, ক্ষত্রিয় এখন বৈশ্যের সেবায় লড়াই করচে, ব্রাহ্মণ এখন বৈশ্যের দাস।

ইন্দ্র। কোথায় জন্মাব সে ত আমার ইচ্ছার উপরে নেই—যেখানে আমাকে আকর্ষণ করে' নেবে, সেইখানেই আমার স্থান হবে।

বৃহস্পতি। আপনি যে ইন্দ্র সেই স্মৃতি কেমন করে'—

ইন্দ্র। সেই স্মৃতি লোপ করে' দিয়ে তবেই আমি মর্ত্ত্যবাসী হয়ে মর্ত্ত্যের সাধনা করতে পারব।

কার্ত্তিকেয়। এতদিন পৃথিবীর অস্তিত্ব ভুলেই ছিলুম, আজ আপনার কথায় হঠাৎ মন ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ল। সেই তন্বী শ্যামা ধরণী সূর্য্যোদয় সূর্য্যাস্তের পথ ধরে' স্বর্গের দিকে কি উৎসুক দৃষ্টিতেই তাকিয়ে

আছে। সেই ভীরুর ভয় ভাঙিয়ে দিতে কি আনন্দ! সেই ব্যথিতার মনে আশার সঞ্চার করতে কি গৌরব! সেই চন্দ্রকান্তমণিকিরীটিনী নীলাম্বরীসুন্দরী কেমন করে' ভুলে গিয়েছে যে সে রাণী! তাকে আবার মনে করিয়ে দিতে হবে যে, সে দেবতার সাধনার ধন, সে স্বর্গের চিরদয়িতা।

ইন্দ্র। আমি সেখানে গিয়ে তার দক্ষিণ সমীরণে এই কথাটি রেখে আস্‌তে চাই যে, তারই বিরহে স্বর্গের অমৃতে স্বাদ চলে' গেছে এবং নন্দনের পারিজাত ম্লান;—তাকে বেষ্টন করে' ধরে' যে সমুদ্র রয়েচে সেই ত স্বর্গের অশ্রু, তারই বিচ্ছেদ-ক্রন্দনকেই ত সে মর্ত্ত্যে অনন্ত করে' রেখেচে।

কার্ত্তিকেয়। দেবরাজ যদি অনুমতি করেন তাহ'লে আমরাও পৃথিবীতে যাই।

বৃহস্পতি। সেখানে মৃত্যুর অবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়ে অমৃতের জ্যোতিকে একবার দেখে আসি।

কার্ত্তিকেয়। বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী তাঁর মাটির ঘরটিতে যে নিত্যনূতন লীলা বিস্তার করেচেন আমরা তার রস থেকে কেন বঞ্চিত হব? আমি যে বুঝ্‌তে পারচি আমাকে পৃথিবীর দরকার আছে, আমি নেই বলেই ত সেখানে মানুষ স্বার্থের জন্যে নির্লজ্জ হয়ে যুদ্ধ করচে, ধর্ম্মের জন্যে নয়।

বৃহস্পতি। আর আমি নেই বলেই ত মানুষ কেবল ব্যবহারের জন্যে জ্ঞানের সাধনা করচে, মুক্তির জন্যে নয়।

ইন্দ্র। তোমরা সেখানে যাবে আমি ত তারই উপায় করতে চলেচি—সময় হ'লেই তোমরা পরিণত ফলের মত আপন মাধুর্য্যভারে সহজেই মর্ত্ত্যে স্খলিত হয়ে পড়বে। সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর।

কার্ত্তিকেয়। কখন টের পাব, মহেন্দ্র, যে আপনার সাধনা সার্থক হ'ল ?

বৃহস্পতি। সে কি আর চাপা থাক্‌বে ? যখন জয়শঙ্খধ্বনিতে স্বর্গলোক কেঁপে উঠ্‌বে তখনি বুঝ্‌ব যে—

ইন্দ্র। না, দেবগুরু, জয়ধ্বনি উঠ্‌বে না। স্বর্গের চোখে যখন করুণার অশ্রু গলে' পড়বে তখনি জান্‌বেন পৃথিবীতে আমার জন্মলাভ সফল হ'ল।

কার্ত্তিকেয়। ততদিন বোধ হয় জান্‌তে পারব না, সেখানে ধূলার আবরণে আপনি কোথায় লুকিয়ে আছেন।

বৃহস্পতি। পৃথিবীর রসই ত হ'ল এই লুকোচুরিতে। ঐশ্বর্য্য সেখানে দরিদ্র-বেশে দেখা দেয়, শক্তি সেখানে অক্ষমের কোলে মানুষ হয়, বীর্য্য সেখানে পরাভবের মাটির তলায় আপন জয়স্তম্ভের ভিত্তি খনন করে। সম্ভব সেখানে অসম্ভবের মধ্যে বাসা করে' থাকে। যা দেখা দেয়, পৃথিবীতে তাকে মান্‌তে গিয়েই

ভুল হয়, যা না দেখা দেয়, তারই উপর চিরদিন ভরসা রাখ্‌তে হবে।

কার্ত্তিকেয়। কিন্তু সুররাজ, আপনার ললাটের চিরোজ্জ্বল জ্যোতি আজ ম্লান হ'ল কেন?

বৃহস্পতি। মর্ত্ত্যে যে যাবেন তার গৌরবের প্রভা আজ দীপ্যমান হয়ে উঠুক।

ইন্দ্র। দেবগুরু, জন্মের যে বেদনা সেই বেদনা এখনি আমাকে পীড়িত করচে। আজ আমি দুঃখেরই অভিসারে চলেচি—তারই আহ্বানে আমার মনকে টেনেচে। শিবের সঙ্গে সতীর যেমন বিচ্ছেদ হয়েছিল, স্বর্গের আনন্দের সঙ্গে পৃথিবীর ব্যথার তেমনি বিচ্ছেদ হয়েচে—সেই বিচ্ছেদের দুঃখ এতদিন পরে আজ আমার মনে রাশীকৃত হয়ে উঠেচে। আমি চল্লুম সেই ব্যথাকে বুকে তুলে নেবার জন্যে। প্রেমের অমৃতে সেই ব্যথাকে আমি সৌভাগ্যবতী করে' তুল্‌ব। আমাকে বিদায় দাও।

কার্ত্তিকেয়। মহেন্দ্র, আমাদের জন্যে পথ করে' দাও, আমরা সেইখানেই গিয়ে তোমার সঙ্গে মিল্‌ব। স্বর্গ আজ দুঃখের অভিযানে বাহির হোক্‌।

বৃহস্পতি। আমরা পথের অপেক্ষাতেই রইলুম, দেবরাজ। স্বর্গ থেকে বাহির হবার পথ করে' দাও, নইলে আমাদের মুক্তি নেই।

কার্ত্তিকেয়। বাহির কর, দেবরাজ, স্বর্গের বন্ধন

থেকে আমাদের বাহির কর—মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আমাদের পথ রচনা কর।

বৃহস্পতি। তুমি স্বর্গরাজ, আজ তুমি স্বর্গের তপোভঙ্গ করে' জানিয়ে দাও যে স্বর্গ পৃথিবীরই।

কার্ত্তিকেয়। যারা স্বর্গ কামনায় পৃথিবীকে ত্যাগ করবার সাধনা করেচে চিরদিন তুমি তাদের পৃথিবীতে ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করেচ—আজ স্বয়ং স্বর্গকে সেই পথে নিয়ে যেতে হবে।

ইন্দ্র। সেই বাধার ভিতর দিয়ে মুক্তিতে পাবার পথ—

বৃহস্পতি। যে মুক্তি আপন আনন্দে চিরদিনই বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করে।

গান

পথিক হে, পথিক হে, ঐ যে চলে, ঐ যে চলে,
সঙ্গী তোমার দলে দলে।

অন্য মনে থাকি কোণে, চমক্ লাগে ক্ষণে ক্ষণে,
হঠাৎ শুনি জলে স্থলে, পায়ের ধ্বনি আকাশতলে।

পথিক হে, পথিক হে, যেতে যেতে পথের থেকে,
আমায় তুমি যেয়ো ডেকে।

যুগে যুগে বারে বারে এসেছিলে আমার দ্বারে,
হঠাৎ যে তাই জানিতে পাই তোমার চলা হৃদয়তলে॥